হজ্জ ও ওমরা পালনকারীকে এতদুভয়ের বিধিবিধান সম্পর্কে অবগতকরণ

কুরআন, সুন্নাহ ও আছারের আলোকে

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনে হামাদ আল-বাদ্‌র

অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

تَبْصِيْرُ النَّاسِكِ بِأَحْكَامِ الْمَنَاسِكِ

في ضوء الكتاب والسنة والآثار

« باللغة البنغالية »

فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد البدر

ترجمة: عبد العليم كوثر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

দু'টি যরূরী কথা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। আরবী ভাষায় হজ্জের উপর অসংখ্য বই-পুস্তক, লিফলেট প্রণীত হয়েছে, আমাদের বাংলা ভাষাও সেক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। এ ভাষায় হজ্জের উপর যেমন রচিত হয়েছে কয়েক ডজন বই, তেমনি আরবী থেকে অনূদিত হয়েছে অসংখ্য বই, লীফলেট। বাংলা দৈনিক পত্রিকা, টিভি চ্যানেল এবং হজ্জের লাইসেন্সধারী প্রায় সবগুলি হজ্জ কাফেলা পৃথক পৃথক হজ্জ ও ওমরা নির্দেশিকা বের করেছে। কিন্তু এত লেখনী থাকা সত্ত্বেও আল্লামা শায়খ আব্দুল মুহসিন ইবনে হামাদ আল-বাদ্‌র (হাফেযাহুল্লা-হ) প্রণীত تَبْصِيْرُ النَّاسِكِ بِأَحْكَامِ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ ও ওমরা পালনকারীকে এতদুভয়ের বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত করণ) বইটি অনুবাদে কেন আগ্রহী হলাম? **জবাবে এক কথায় বলা যায়, বইটি হজ্জের উপর আমার দেখা সবচেয়ে ভাল বই।** কেননা বইটিতে স্বতন্ত্র বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে, যেগুলি অন্য কোন বইয়ে মিলা ভার। যেমনঃ

১. সম্মানিত লেখক বর্তমান বিশ্বের হাদীছ বিশারদগণের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল

জামা‘আতের আক্বীদার এক অতন্দ্র প্রহরী। সেজন্য বইটিতে বিভ্রান্তিপূর্ণ এবং আক্বীদা বিরোধী কোন প্রকার বক্তব্যের গন্ধও নেই।

২. বইটিতে হাজীদের হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যরূরী ছোট-বড় প্রত্যেকটি বিধিবিধান এবং মাসআলা-মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. ছোট-বড় কোন মাসআলাই দলীলবিহীন উল্লেখ করা হয় নি; বরং প্রত্যেকটি বক্তব্যের পেছনে পবিত্র ক্বুরআন, ছহীহ হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম)-এর আছার থেকে এক বা একাধিক দলীল পেশ করা হয়েছে।

৪. বইটির বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার এবং সাবলীল, যা অন্য কোনো বইয়ে আমি দেখি নি।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কুরআন এবং হাদীছের ভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী অনেক মুসলিম আরবী পড়তে পারে না! কেবল তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বইটির যরূরী দো‘আ এবং যিক্‌র—আয্‌কার বাংলায় উচ্চারণ করে দেওয়া হয়েছে; যদিও আরবী বর্ণসমূহকে বাংলা ভাষায় সঠিক এবং পরিপূর্ণভাবে উচ্চারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

অত্র বইয়ের দো‘আ/যিকরের উচ্চারণ পদ্ধতি

আরবী অক্ষর	বাংলা অক্ষর/চিহ্ন	উদাহরণ
সুকূনযুক্ত হামযা ءْ أْ ؤْ	**’**	হাইয়ি’ (هَيِّئْ)
ع	**‘**	আন‘আমতা (أَنْعَمْتَ), নি‘মাতাকা (نِعْمَتَكَ)
ث، ص	**ছ**	ছাবা-তা (الثَّبَاتَ), ছদ্‌রী (صَدْرِي)
ج	**জ**	মূজিবা-তি (مُوجِبَاتِ), ওয়াজ্‌‘আল (وَاجْعَلْ)
ذ، ز، ض، ظ	**য**	আ-খিযুন (آخِذٌ), আওযি‘নী (أَوْزِعْنِي), ফাযলিকা (فَضْلِكَ), যলামনা- (ظَلَمْنَا)
س	**স**	হুসনা (حُسْنَ), সালীমান (سَلِيمًا)
ش	**শ**	শাক্কা-রান (شَكَّارًا)

ط	**ত্ব**	ত্বইয়্যেবাহ (طَيِّبَةً)
ق	**ক্ব**	ক্বলবী (قَلْبِي)
টেনে পড়ার জন্য	**-**	রব্বানা- (رَبَّنَا), ‘আযা-বি (عَذَابِ)
	ঈ	না‘ঈমান (نَعِيمًا)
	◌ী	খত্বীআতী (خَطِيئَتِي)
	ঊ	আ‘ঊযুবিকা (أَعُوذُ بِكَ)
	◌ূ	সাবাক্বূনা- (سَبَقُونَا)

পরিশেষে, অনুবাদকের কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহপাক তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। মহান আল্লাহ হাজীদেরকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে হজ্জ করার তাওফীক্ব দান করুন এবং তাদের হজ্জকে ‘ক্ববূল হজ্জ’ হিসাবে মঞ্জুর করুন। আমীন!

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার
abdulalim.kawsar@yahoo.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি ফরযসমূহ ফরয করেছেন, যথাযথভাবে নানা বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর সম্মানিত ঘরের হজ্জকে ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ ও বৃহৎ স্থাপনা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, শরীক বিহীন এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন হক্ক মা‘বূদ নেই, যিনি অনুগ্রহ, মহত্ত্ব এবং মহাসম্মানের অধিকারী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল, যিনি মানব ও জিন জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং যিনি ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ও ওমরা পালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব। হে আল্লাহ! আপনি দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষণ করুন, তাঁর প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবার-পরিজনের প্রতি, মানব ও জিন জাতির পথপ্রদর্শক, অন্ধকারের মশাল ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি এবং তাঁদের পথের পথিকদের প্রতি, যারা তাদের পরে আগমণ করেছে, অন্তর ও বাক্যকে বিশুদ্ধ ও ভালো রাখতে সক্ষম হয়েছে,

﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة الحشر: ١٠]

'তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ আপনি রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়' *(হাশ্‌র ১০)*।

অতঃপর,

মহান আল্লাহ মানব এবং জিন জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে কল্যাণকর যাবতীয় পথ বাৎলে দিয়েছেন, যাবতীয় অকল্যাণ থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। শেষ যামানায় আল্লাহ কর্তৃক মানব এবং জিন জাতিকে প্রদত্ত নে'মতসমূহের মধ্যে এটিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট নে'মত। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন; সেগুলি হচ্ছে: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেওয়া, রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা। প্রসিদ্ধ হাদীছ

‘হাদীছে জিবরীল’-য়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীছে জিবরীল ‘আলাইহিস্‌সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান, ক্বিয়ামত এবং ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন; আর সবশেষে তিনি বলেছিলেন, “এই হচ্ছে জিবরীল, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছেন”।

তন্মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

«الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»

‘আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা‘বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল-একথার সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে কা‘বায় হজ্জ করা-ই হচ্ছে ইসলাম’ *(মুসলিম,হা/৯৩, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণিত)*।

অনুরূপভাবে ছহীহ বুখারী *(হা/৮)* এবং মুসলিমে *(হা/১১৩)* ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: 'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল-একথার সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা'।

এই পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল'-একথার সাক্ষ্য দেওয়া। আর একথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা চলবে না এবং ইবাদত হতে হবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায়। অতএব, কোন ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত তরীক্বায় না হলে তা ইবাদতকারীর সামান্যতম কোনো কাজে আসবে না।

এরপরের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে, ছালাত ক্বায়েম করা। ছালাতকে 'ইসলামের মূল খুঁটি' এবং 'যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাধাদানকারী' বলা হয়েছে। দুনিয়াতে দ্বীন ইসলামের সর্বশেষ যে ইবাদতটি হারিয়ে যাবে, তা হচ্ছে ছালাত। আর ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে বান্দার হিসাব নেওয়া হবে,

তা হচ্ছে এই ছালাত। দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হয় বলে এটি বান্দা এবং তার প্রভুর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মাধ্যম।

এরপর যাকাতের অবস্থান। মহান আল্লাহ এই যাকাতকে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ছালাতের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন। যাকাতের নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে; এর মাধ্যমে যাকাত আদায়কারী যেমন অনেক নেকী লাভে ধন্য হয়, তেমনি ফক্বীর-মিসকীনও অনেক উপকৃত হয়। আল্লাহ ধনীদের সম্পদে প্রত্যেক বছর সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন। সেজন্য যাকাত আদায় করলে ধনী ব্যক্তি মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কিন্তু দরিদ্র মানুষ খুব উপকৃত হয়।

যাকাতের পরে ছিয়ামের অবস্থান। প্রত্যেক বছর রামাযান মাসে এই ছিয়াম পালন করতে হয়।

অতঃপর আসে হজ্জের অবস্থান, যা জীবনে একবার ফরয।

অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণ কর্তৃক হজ্জ ও ওমরার বিধিবিধান সংক্রান্ত ছোট-বড় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অধিক উপকারী গ্রন্থসমূহের মধ্যে আমাদের শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহেমাহুল্লাহ) বিরচিত **'আত-তাহক্বীক্ব ওয়াল ঈযাহ**

লিকাছীরিন মিন মাসাইলিল হাজ্জি ওয়াল ওমরাতি ওয়ায যিয়ারাহ আলা যওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ’ নামক পুস্তিকাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকবার এই পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছে এবং বহু ভাষায় সেটি অনূদিত হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে ব্যাপক উপকার সাধিত হয়েছে এবং জ্ঞান পিপাসুদের নিকট তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ১৩৬৩ হিজরীতে বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহেমাহুল্লাহ)-এর অর্থায়নে বইটি প্রথম প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে শায়খ এতে কিছু মাসআলা-মাসায়েল সংযোজন করেন। তিনি ১৪২০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

দীর্ঘদিন থেকে হজ্জ ও ওমরার উপর একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনার প্রতি আমি আগ্রহী ছিলাম। অবশেষে, ১৪২৮ হিজরীতে এই ছোট্ট পুস্তিকা প্রণয়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমার আগ্রহ বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেন। আমি এই পুস্তিকার নাম দিয়েছি: **‘তাবছীরুন নাসেক বিআহকামিল মানাসেক আলা যওইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়াল মা’ছূরি আনিছ ছহাবাহ’**।

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমার এই প্রয়াসটুকু ক্ববূল করুন, দয়া করে তিনি আমাকে এর বিনিময়ে নেকী দান করুন, জ্ঞান পিপাসু ছাত্রবৃন্দ এবং আল্লাহর সম্মানিত ঘরের ইচ্ছাপোষণকারী (হজ্জ ও উমরাপালনকারী) কে এর মাধ্যমে

উপকৃত করুন। বইটি যিনি প্রকাশক করবেন, বা প্রকাশে সহযোগিতা করবেন আল্লাহ তাকে সওয়াবের ভাগীদার করুন, আর সমস্ত মুসলিমকে তিনি দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং তাদেরকে হক্কের উপর অবিচল রাখুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং দো'আ ক্ববূলকারী।

হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর যেসব আদব-আখলাক্ব থাকা উচিৎ

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হজ্জ ও ওমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে; লোক দেখানো এবং জনশ্রুতির নিয়্যত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাহলে হজ্জ ও ওমরা পালনকারী এতদুভয়ের মাধ্যমে নেকী লাভ করতে পারবে। ছহীহ মুসলিমে *(হা/৭৪৭৫)* এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, শির্ককারীর শির্ক থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করতে গিয়ে আমার সাথে কারো অংশী স্থাপন করে, আমি তাকে তার শির্কযুক্ত আমলসহ পরিত্যাগ করি'। অনুরূপভাবে সুনানে ইবনে মাজাহতে *(হ/২৮৯০)* যঈফ সূত্রে আনাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! এই হজ্জ লোক দেখানোর জন্য নয় এবং নয় জনশ্রুতি অর্জনের জন্য'। শায়খ আলবানী (রহেমাহুল্লাহ) 'সিলসিলাহ ছহীহাহ' *(হা/২৬১৭)*-তে হাদীছটির আরো কয়েকটি 'সনদ' উল্লেখ করেছেন, যার সবগুলি মিলে হাদীছটি 'হাসান লিগায়রিহী'-এর পর্যায়ে পৌঁছে।

২. জাগ্রত জ্ঞান সহকারে হজ্জ ও ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে হাজী ছাহেবকে এতদুভয়ের বিধিবিধান জেনে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য তাকে এ বিষয়ে প্রণীত ভাল একটি বই সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহেমাহুল্লাহ) প্রণীত একটু আগে বর্ণিত পুস্তিকাটি অধিক উপকারী হওয়ায় হাজী ছাহেব এটি সংগ্রহ করতে পারেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ভুলে পতিত হওয়ার কবল থেকে রক্ষা পেতে হলে হজ্জ ও ওমরার কোনো কাজ শুরু করার আগেই সে সম্পর্কে বিজ্ঞ কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

৩. হজ্জের সফরে ভাল মানুষদের সাহচর্য লাভের চেষ্টা করতে হবে, তাহলে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান এবং আদব উভয় ক্ষেত্রেই উপকৃত হওয়া যাবে। ছহীহ বুখারী *(হা/৫৫৩৪)* এবং মুসলিমে *(হা/৬৬৯২)* আবূ মূসা আশ‘আরী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً»

‘সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আতর বিক্রেতা এবং কামারের মত। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে আতর

প্রদান করবে, না হয় তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনে নিবে, আর না হয় তুমি অন্ততঃ তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে কামার হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে, আর না হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে’।

৪. অন্যের কাছে যাতে হাত পাততে না হয়, সেজন্য হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে নিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ»

‘যে ব্যক্তি হারাম এবং অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবেন’ *(বুখারী, হা/১৪৬৯; মুসলিম, হা/২৪২৪, আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত)*।

৫. উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে এবং অন্যের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»

‘তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ সচেতনতা অবলম্বন করবে। মন্দ কিছু ঘটে গেলে তারপরে ভাল কাজ করবে, তাহলে এই ভাল কাজ ঐ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে’ *(তিরমিযী, হা/১৯৮৭, আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে ‘হাসান’ সূত্রে বর্ণিত)*।

অনুরূপভাবে ছহীহ মসুলিমে *(হা/৪৭৭৬)* আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে ‘মারফূ’ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

«فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»

‘যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার সে তাদের কাছ থেকে আশা করে’।

৬. হাজী ছাহেব যিক্‌র-আযকার, দো‘আ, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবে। মন্দ কথা থেকে জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবে, ভাল কথা ছাড়া বলবে না। দুনিয়া এবং আখেরাতে প্রশংসনীয় ফলাফল বয়ে আনে এমন কর্মকাণ্ডে তার

সময়কে কাজে লাগাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’ *(বুখারী, হা/৬৪৭৫; মুসলিম, হা/৭৪, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত)*।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ»

‘দুই ধরণের নে‘মতের কাছে বেশীর ভাগ মানুষ প্রবঞ্চিত হয়: সুস্থতা এবং অবসর’ *(বুখারী, হা/৬৪১২, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*।

৭. কথা বা কর্ম দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

‘মুসলিম সে-ই ব্যক্তি, যার মুখ এবং হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে’ *(বুখারী, হা/১০; মুসলিম, হা/৬৪)*।

অনুরূপভাবে কারো ধূমপানের বদাভ্যাস থাকলে সে সিগারেটের দুর্গন্ধের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে সাবধান থাকবে; বরং সম্পূর্ণরূপে ধূমপান বর্জন করে আল্লাহ্‌র নিকট তার তওবা করা ওয়াজিব। কেননা ধূমপানে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, অন্যদিকে তেমনি অর্থ নষ্ট হয়।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপরোক্ত সুন্দর আদবগুলি বাস্তবায়ন করা উচিৎ। তবে হজ্জ ও ওমরার সফরে সেগুলির গুরুত্ব আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হজ্জ ও ওমরার ফযীলত

হজ্জ ও ওমরার ফযীলত বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে; তন্মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলঃ

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ»

‘এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা পালন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের ছগীরা গোনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ। আর ক্ববূল হজ্জের বিনিময় জান্নাত বৈ কিছুই নয়’ *(বুখারী, হা/১৭৭৩;*

মুসলিম, হা/৩২৮৯, হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত)।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ»

‘তোমরা হজ্জ ও ওমরা পালনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখ। কেননা এতদুভয় দরিদ্রতা এবং গোনাহ দূর করে দেয়, যেমনিভাবে হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। আর ক্ববূল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত বৈ কিছুই নয়’ *(তিরমিযী, হা/৮১০; ইবনে খুযায়মা, হা/২৫১২; নাসা‘ঈ, হা/২৬৩১, ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণিত এবং হাদীছটি ‘হাসান’। ইমাম নাসা‘ঈ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে ‘ছহীহ’ সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন (হা/২৬৩০), তবে সেখানে ‘সোনা-রূপার’ কথা আসে নি এবং শেষ বাক্যটিও বর্ণিত হয়নি)।*

৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟»

‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জিহাদকে আমরা উত্তম আমল মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?’ জবাবে রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا، لكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»

‘না! তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে, ক্ববূল হজ্জ’ *(বুখারী, হা/১৫২০)*। হাফেয ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) ফতহুল বারীতে *(৩/৩৮২)* বলেন, ‘অধিকাংশ বিদ্বান (لكُنَّ)-এর ‘কাফ’ (كُ) বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন। শব্দটি মহিলাদের সম্বোধন সূচক পদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ‘কাফ’ (كِ) বর্ণে জের দিয়ে এবং ‘কাফ’-এর পূর্বে একটি অতিরিক্ত আলিফ যোগেও শব্দটি পড়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি ‘ইস্তিদরাক’ (استدراك) বা প্রতিকার অর্থে ব্যবহৃত হবে’। অতঃপর ইবনে হাজার বলেন, ‘পেশ দিয়ে পড়লে শব্দটি বেশী ফায়দা দেয়। কেননা এক্ষেত্রে শব্দটি একদিকে যেমন হজ্জের ফযীলত সাব্যস্ত করে, অন্যদিকে তেমনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর জিহাদ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবও শামিল করে’। তাছাড়া শব্দটি ‘ইস্তিদরাক’ অর্থে ব্যবহৃত হলে হাদীছটি থেকে এও বুঝা যেতে পারে যে, হজ্জ জিহাদের চেয়ে উত্তম। আর এমন অর্থ আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত আগত

হাদীছের বিরোধী। অতএব, এই যুক্তিও ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ)-এর অভিমতকে শক্তিশালী করে।

ইবনে মাজাহ *(হা/২৯০১)* এবং ইবনে খুযায়মা *(হা/৩০৭৪)* উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟»

'আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! মহিলাদের উপর কি জিহাদ আছে?' তিনি বললেন,

«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»

'তাদের উপর জিহাদ আছে, তবে তাতে লড়াই নেই। আর তা হচ্ছে, হজ্জ ও ওমরা'।

৪. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনা'। তাঁকে বলা হয়েছিল, এরপর কি? তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা'। তাঁকে আবার বলা হয়েছিল,

এরপর কি? তিনি বলেছিলেন, ‘ক্ববূল হজ্জ’ *(বুখারী, হা/২৬; মুসলিম, হা/২৪৮)*।

৫. আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

‘যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং স্ত্রী সহবাস, যাবতীয় অশ্লীল কর্ম ও গালমন্দ থেকে বিরত থাকল, সে ঐদিনের মত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন’ *(বুখারী, হা/১৫২১; মুসলিম, হা/৩২৯১)*।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল আছ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) কে বলেছিলেন,

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

‘হে আমর! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মোচন করে দেয়? হিজরত তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মোচন করে দেয়? হজ্জ তার পূর্ববর্তী সকলগোনাহ মোচন ধ্বংস করে দেয়?’ *(মুসলিম, হা/৩২১)*।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতিতে যে হজ্জ সম্পন্ন করা হয়, যাতে অশ্লীল কর্ম ও কথার সংমিশ্রণ না থাকে এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়, সেটিই হচ্ছে ‘ক্ববূল হজ্জ’। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ» ‘তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখ। আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমার এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করব না’ *(মুসলিম, হা/৩১৩৭)*। ইমাম নাসা‘ঈ *(হা/৩০৬২)* বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজ্জের পদ্ধতি শিখ। আমি জানি না, সম্ভবতঃ এই বছর পরে আমি আর হজ্জ করব না’।

আর ক্ববূল হজ্জের নিদর্শন হচ্ছে, হজ্জ থেকে ফিরে হাজী ছাহেব সুন্দর থেকে সুন্দরতর এবং মন্দ থেকে ভালোর পথে পা বাড়াবে। কেউ যদি হজ্জের পূর্বে কোন পাপাচারে পতিত হয়ে থাকে, তাহলে হজ্জে গিয়ে তাকে খাঁটি তওবা করতে হবে; পাপকাজ বর্জনের অঙ্গীকার করতে হবে, ঘটিত পাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে এবং পুনরায় ঐপাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। তবে তার পাপ যদি কোন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে তা মিটিয়ে নেওয়ার কয়েকটি

পদ্ধতি রয়েছে: যদি তা অর্থনৈতিক কোনো বিষয় হয় এবং যার সাথে লেনদেন, সে তা মাফ না করে, তাহলে অর্থ পরিশোধ করে দিতে হবে। আর মুখ এবং হাত দ্বারা যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উল্লেখ্য যে, কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি তার সামনে উল্লেখ করতে গেলে যদি হিংসা-বিদ্বেষ এবং দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে বিষয়টি তাকে না বলে সাধারণভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, তার যথোপযুক্ত প্রশংসা করতে হবে এবং তার জন্য দো‘আ করতে হবে। উক্ত বিষয়গুলি মেনে চলতে পারলে হজ্জ তার সামনে কল্যাণের দুয়ার উম্মুক্ত করে দিবে এবং সে আল্লাহ্‌র ভীতিপূর্ণ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। **কিন্তু হজ্জের পূর্বে তিনি যদি মন্দ কাজে লিপ্ত থাকেন এবং হজ্জের পরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন, তাহলে বুঝতে হবে, তার হজ্জ ক্ববূল হয় নি।**

ছালাত, হজ্জসহ অন্যান্য সৎ আমল যেসব গোনাহ্‌র কাফফারাহ হয়, সেগুলি হচ্ছে, **ছগীরা বা ছোট গোনাহ**। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ﴾ [النساء: ٣١]

‘যেসব বড় গোনাহ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলি থেকে যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দেব’ *(নিসা ৩১)*। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম‘আ অপর জুম‘আর সময় পর্যন্ত এবং এক রামাযান অপর রামাযানের সময় পর্যন্ত ছোট গোনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ, যদি বড় গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়’ *(মুসলিম, হা/৫৫২, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত)*। **তবে কাবীরাহ বা ছোট গোনাহসমূহ তওবা ছাড়া মোচন হয় না।**

সুতরাং ছোট-বড় যাবতীয় গোনাহ থেকে তওবা করে একজন হাজী সদ্য প্রসূত নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে হজ্জ থেকে ফেরার মহা সাফল্য অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ তওবা না করে যদি পাপ করে অথবা পাপ করার সংকল্প করে, তাহলে সে অপরাধী এবং নিন্দিত হিসাবে গণ্য হবে। এরশাদ হচ্ছে,

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ ﴾ [الانعام: ١٦٠]

‘যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে।

বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলম করা হবে না’ *(আন‘আম ১৬০)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে কাছীর (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘পাপ কাজ পরিত্যাগকারী তিন ধরনেরঃ **প্রথম** শ্রেণীর পাপ পরিত্যাগকারী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই পাপ বর্জন করে। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পাপ বর্জনের কারণে তার আমলনামায় নেকী লেখা হবে। কেননা এক্ষেত্রে আমল এবং নিয়্যত উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে। সেজন্য ছহীহ হাদীছে এসেছে, আল্লাহ বলেন, ‘সে আমার জন্য পাপ বর্জন করেছে’। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** পাপ বর্জনকারী ভুলবশতঃ এবং অন্যমনস্ক হয়ে পাপ বর্জন করে। আর এই শ্রেণীর পাপ বর্জনকারীর নেকী বা পাপ কোনটিই হবে না। কেননা সে কল্যাণেরও নিয়্যত করে নি, আবার মন্দ কাজও সম্পাদন করে নি। **আরেক শ্রেণীর** পাপ বর্জনকারী পাপ কাজের প্রচেষ্টা করার পর অপারগতা এবং অলসতাবশতঃ তা ত্যাগ করে। এই শ্রেণীর পাপ বর্জনকারী পাপ সম্পাদনকারীর মতই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দু’জন মুসলিম তরবারী নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে হত্যাকারী এবং নিহত উভয়ই জাহান্নামে যাবে।” ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হত্যাকারীর বিষয়টিতো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন, কারণ নিহত ব্যক্তিও হত্যাকারীকে হত্যার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল’ *(বুখারী, হা/৩১;*

মুসলিম, হা/৭২৫৩, আবূ বাকরা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত)।

হজ্জ ও ওমরা পালন ওয়াজিব

হজ্জ ও ওমরা ফরয হওয়ার পর দ্রুত সম্পাদন করা জীবনে একবার ওয়াজিব। একবারের বেশী হলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে। তবে হজ্জ বা ওমরার মানত করলে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ নফল হজ্জ বা ওমরা পালন শুরু করলে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব হবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

‘আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর’ *(বাক্বারাহ ১৯৬)*।

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণে পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ এবং ইজমা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

‘আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে, তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয। কিন্তু যে ব্যক্তি তা মানে না;

আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগৎ থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

'ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: 'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল-একথার সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা' *(বুখারী, হা/৮; মুসলিম, হা/১১৩, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*।

হাদীছে জিবরীলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»

'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল-একথার সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বায়

হজ্জ করাই হচ্ছে ইসলাম' *(মুসলিম, হা/৯৩, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণিত)*।

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا» 'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হজ্জ কর'। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল? প্রত্যেক বছর হজ্জ আদায় করা কি ফরয? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। লোকটি তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করলেন; অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» 'আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রত্যেক বছর তা ফরয হয়ে যেত এবং তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতে না' *(মুসলিম, হা/৩২৫৭)*।

তাছাড়া যার মধ্যে হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকবে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত পোষণ করেছেন।

নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ ওমরা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করেঃ

১. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র

রাসূল! নারীদের উপর কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তাদের উপর জিহাদ আছে; তবে তাতে লড়াই নেই। আর তা হচ্ছে, হজ্জ এবং ওমরা' *(আহমাদ, হা/২৫৩২২; ইবনে মাজাহ, হা/২৯০১; ইবনে খুযায়মা, হা/৩০৭৪)*। ইমাম আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ্‌র নিকটে হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত বিশিষ্ট, আর ইবনে খুযায়মা হাদীছটি বর্ণনার পর বলেন, নারীদের উপর লড়াইবিহীন জিহাদ আছে' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে চেয়েছেন যে, হজ্জের মত ওমরাও ওয়াজিব। কেননা (عليهن) 'তাদের উপর জিহাদ আছে' বাক্যটি ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। কারণ নফল কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

২. ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীছে জিবরীলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ»

'আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল-একথার সাক্ষ্য দেওয়া, ছালাত ক্বায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ ও ওমরা করা, বীর্যপাত অথবা সহবাস জনিত কারণে

অপবিত্র হলে গোসল করা, পূর্ণরূপে অযূ করা এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা-ই হচ্ছে ইসলাম' *(ইবনে খুযায়মা, হা/৩০৬৫, সনদ 'ছহীহ', বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (ثقات); দারাক্বুতনী, ২/২৮২, তিনি এর সনদকে 'ছহীহ' বলেছেন)*।

৩. আবূ রাযীন উক্বায়লী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন,

«إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ। তিনি হজ্জ, ওমরা বা সফর কোনটিই করতে সক্ষম নন'। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ এবং ওমরা আদায় করো' *(তিরমিযী, হা/৯৩০, তিনি বলেন, হাদীছটি 'হাসান-ছহীহ'; হাদীছটি মুসলিমের শর্তবিশিষ্ট)*।

৪. ছুবাই ইবনে মা'বাদ ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি বেদুঈন খৃষ্টান ছিলাম; তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদ করতে আগ্রহী, কিন্তু আমার উপর হজ্জ ও ওমরা ফরয। আমার সম্প্রদায়ের একজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি হজ্জ ও ওমরা একসাথে আদায় করে নাও এবং কুরবানী কর। ফলে আমি

একসাথে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বেঁধেছি। তখন ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) আমাকে বললেন, ‘তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মোতাবেক আমল করেছ’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৭৯৯, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটির সনদ ‘ছহীহ’)*।

হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

প্রত্যেকটি মুসলিম, বোধশক্তি সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ ও ওমরা ফরয। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শর্ত যুক্ত হবে; আর তা হচ্ছে, তাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে।

* অতএব, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন কাফের হজ্জ এবং ওমরার আদেশে আদিষ্ট নয়; বরং কাফের অবস্থায় কেউ তা আদায় করলেও শুদ্ধ হবে না। কেননা কাফের সর্বপ্রথম শরী‘আতের উছূল (أصول) বা ঈমান আনয়নে আদিষ্ট। তবে উছূল বা মৌলিক বিষয়ের সাথে শরী‘আতের অন্যান্য ফুরূ বা শাখা-প্রশাখায় তারা আদিষ্ট কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও সঠিক কথা হচ্ছে, তারা মূল উছূলের অনুগামী হয়ে শরী‘আতের অন্যান্য ফুরূ বা শাখা-প্রশাখা প্রতিপালনেও আদিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ۝٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ۝٧﴾ [فصلت: ٦، ٧]

'আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে' *(ফুছছিলাত, ৬-৭)*।

অনুরূপভাবে জাহান্নামে কাফেরদের বক্তব্য তুলে ধরে আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ۝٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلۡخَآئِضِينَ ۝٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٤٦ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلۡيَقِينُ ۝٤٧ ﴾ [المدثر: ٤٣، ٤٧]

'তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায় করতাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। আর আমরা মৃত্যুবধি প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম' *(মুদ্দাছছির ৪৩-৪৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝٣١ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝٣٢ ﴾ [القيامة: ٣١، ٣٢]

'সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি; পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে' *(ক্বিয়ামাহ ৩১-৩২)*। শরী'আতের 'ফুরূ' (فروع) বা শাখা-প্রশাখাতে তাদেরকে সম্বোধন

করার অর্থ হল, উছূল এবং ফুরূ ত্যাগ করার কারণে তাদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ কারণেই মুসলিমগণ যেমন জান্নাতে মর্যাদার দিক দিয়ে সমান হবে না, তেমনি কাফেররাও জাহান্নামের নিম্ন স্তরে অবস্থানের দিক দিয়ে সমান হবে না। আর কুফরীর ধরন বিভিন্ন হওয়ার কারণে জাহান্নামে তাদের অবস্থানও বিভিন্ন হবে। যেমনঃ একজন মুনাফিক্ব, অগ্নিপূজক ও ইয়াহুদী-খৃষ্টানের স্বাভাবিক কুফর এবং তাদের অন্য আরেক জন কর্তৃক কোনো মুসলিমকে আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে বাধা প্রদানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সেজন্যই মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابًا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ ۝٨٨ ﴾ [النحل: ٨٨]

'যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত' *(নাহ্‌ল ৮৮)*। হাফেয ইবনে কাছীর (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'অর্থাৎ তাদের কুফরীর কারণে শাস্তি দেওয়া হবে, আর লোকদেরকে হক্বের পথ থেকে বাধা দানের কারণে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে'। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۝٩٠ ﴾ [ال عمران: ٩٠]

‘যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং কুফরীতে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কস্মিনকালেও তাদের তওবা ক্বুবুল করা হবে না। আর তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট’ *(আলে ইমরান ৯০)*। অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٦٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ ﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٩]

‘যারা কুফরী করেছে এবং যুলম করেছে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল’ *(নিসা ১৬৮-১৬৯)*।

* অনুরূপভাবে কোনো পাগলও হজ্জ ও ওমরার নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। সেজন্য কোনো পাগল হজ্জ ও ওমরা আদায় করলেও হতবুদ্ধি হওয়ার কারণে তা তার পক্ষ থেকে শুদ্ধ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

‘তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত, অপ্রাপ্ত

বয়ষ্ক ছেলে-মেয়ে প্রাপ্ত বয়ষ্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল বিবেক-বুদ্ধি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত' *(আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩, হাদীছটি আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ সূত্রে বর্ণিত; আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকেও এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে)*।

অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক বালক-বালিকা এবং দাসের উপরেও হজ্জ-ওমরা ওয়াজিব নয়। তবে তারা যদি এতদুভয়টি আদায় করে, তাহলে তা তাদের পক্ষ থেকে শুদ্ধ হবে এবং যারা তাদেরকে হজ্জ ও ওমরা করিয়েছে, তারা সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»

'এক মহিলা তার বাচ্চাকে উঁচু করে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এর কি হজ্জ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আর তুমি নেকী পাবে' *(মুসলিম, হা/৩২৫৪)*। ইমাম বুখারী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ»

‘সাত বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছিল’ *(হা/১৮৫৮)*। তবে তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ-ওমরা শুদ্ধ হলেও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে এবং দাসমুক্তির পরে সামর্থ্যবান হলে তাদেরকে আবার তা আদায় করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

«احْفَظُوا عَنِّي، وَلاَ تَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا، ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ»

‘আমার পক্ষ থেকে তোমরা মুখস্থ করে নাও, তবে তোমরা বলো না যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, (তা হচ্ছে এই যে): কোনো দাসকে তার পরিবার-পরিজন হজ্জ করালে, দাসমুক্তির পর তার উপর আবার তা ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে যে কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে তার পরিবার-পরিজন বাল্যাবস্থায় হজ্জ করাল, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তার উপর তা আবার ওয়াজিব হবে’ *(ইবনু আবী শায়বাহ, হা/১৪৮৭৫, সনদ ‘ছহীহ’, উল্লেখ্য যে, ইবনু আবী শায়বাহ ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ এবং তাঁর সনদ তাঁদের শর্তের অনুরূপ; বায়হাক্বী মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন, ৪/৩২৫)*। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর উক্তি ‘আমার পক্ষ থেকে তোমরা মুখস্থ করে নাও, তবে তোমরা বলো না যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন’ প্রমাণ করে

যে, হাদীছটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত।

হজ্জ ও ওমরার ক্ষেত্রে সামর্থ্যবান বলতে দৈহিক ও আর্থিক উভয় সামর্থ্যকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

‘আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে, তার উপর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এ ঘরের হজ্জ করা ফরয’ *(আলে ইমরান ৯৭)*। অতএব, বার্ধক্য জনিত কারণে অথবা সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না এমন অসুস্থতার কারণে কেউ হজ্জ ও ওমরা আদায়ে অপারগ হলে তা তার উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে শারীরিক সামর্থ্য আছে কিন্তু অর্থ নেই এমন ব্যক্তির উপরেও হজ্জ-ওমরা ওয়াজিব নয়। তবে শারীরিকভাবে অপারগ ব্যক্তির নিকটে অর্থ থাকলে তাকে অবশ্যই কারো মাধ্যমে বদলী হজ্জ করিয়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বদলী হজ্জ বা ওমরা আদায়কারীকে আগে নিজের পক্ষ থেকে তা আদায় করতে হবে। আবূ রাযীন উক্বায়লী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা বৃদ্ধ মানুষ। তিনি হজ্জ, ওমরা বা সফর কোনটিই করতে সক্ষম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ এবং

ওমরা আদায় করে দাও' *(হাদীছটি 'হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদে গত হয়ে গেছে)*। ফাযল ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'বিদায় হজ্জের বছরে খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার বৃদ্ধ পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে; কিন্তু তিনি সফর করতে সক্ষম নন। এক্ষণে তাঁর পক্ষ থেকে আমি হজ্জ আদায় করে দিলে কি তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ' *(বুখারী, হা/১৮৫৪; মুসলিম, হা/৩২৫২)*। হাদীছটি আরো প্রমাণ করে যে, পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলাও বদলী হজ্জ করতে পারে।

কারো আর্থিক সামর্থ্য থাকা অবস্থায় সে মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হজ্জের খরচের সমপরিমাণ অর্থ নিয়ে হজ্জ করেছে এমন কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করিয়ে নিতে হবে। বুরায়দাহ ইবনুল হাছীব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছে এসেছে, এক মহিলার মা মারা গেলে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আমার মা কখনও হজ্জ করেন নি, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(মুসলিম, হা/২৬৯৭)*।

কোন মহিলার দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জে তার সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা পর্যন্ত তাকে সামর্থ্যবান গণ্য করা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

‘মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া কোন মহিলা সফর করবে না। কোন পুরুষ কোন মহিলার নিকটে তার মাহরামের অনুপস্থিতিতে যাবে না। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অমুক সৈন্য দলের সাথে যুদ্ধে যেতে চাই, কিন্তু আমার স্ত্রী চায় হজ্জে যেতে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «اخْرُجْ مَعَهَا» তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও’ *(বুখারী, হা/১৮৬২; মুসলিম, হা/৩২৭২, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*। উক্ত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীকে যুদ্ধ ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে হজ্জের সফরে যেতে বললেন। কোন মহিলা মাহরাম ছাড়া হজ্জ সম্পাদন করলে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। তবে মাহরাম ছাড়া সফর করার কারণে সে গোনাহগার হবে। কেননা মাহরাম সঙ্গে থাকা হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, হজ্জ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। অবশ্য মক্কাবাসী কোনো মহিলা নিরাপদ ও বিশ্বস্ত যে কোন সফর সঙ্গীর সাথে হজ্জ করতে

পারে। কেননা মক্কা থেকে হজ্জ করলে কোনো সফরের প্রয়োজন পড়ে না। অতএব, সেখানে মাহরামেরও কোনো প্রশ্ন আসে না।

আর একজন মহিলার মাহরাম হচ্ছে, তার স্বামী এবং বংশ ও অন্য যে কোন বৈধ সূত্রে তার জন্য স্থায়ীভাবে বিবাহ বন্ধন হারাম এমন পুরুষ। বংশ সূত্রে স্থায়ী মাহরাম পুরুষের উদাহরণ হচ্ছে, মহিলার পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা। অন্য দু'টি 'বৈধ সূত্রে' কেউ স্থায়ী মাহরাম হতে পারেঃ **১. দুগ্ধপান সম্পর্কিত সূত্রে,** যেমন: মহিলার দুধপান সম্পর্কীয় পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা; **২. বৈবাহিক সূত্রে,** যেমন: মহিলার শ্বশুর, তার স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে, তার মায়ের অন্য স্বামী- যার সাথে তার মায়ের মিলন ঘটেছে, মেয়ের জামাই।

'বৈধ সূত্র' দ্বারা নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগকারী স্বামীকে (যাতে লি'আন হয়ে তাদের মধ্যে পৃথকীকরণ হয়েছে এমন লোককে) মাহরামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা অভিযুক্ত স্ত্রী ঐ স্বামীর জন্য চিরদিনের জন্য হারাম হবে এবং সে তার মাহরাম হতে পারবে না। যেসব পুরুষ কোনো মহিলার জন্য অস্থায়ীভাবে হারাম, তারাও মাহরাম হতে পারবে না। যেমন: স্ত্রীর বোন, তার ফুফু, তার খালা, স্ত্রীর ভাই ও বোনের মেয়ে। কেননা কোনো পুরুষ কোনো মহিলার জন্য মাহরাম হওয়ার

শর্ত হল, তাদের উভয়ের মধ্যে চিরদিনের জন্য বৈবাহিক বন্ধন হারাম হতে হবে।

হজ্জ ও ওমরার রুকনসমূহ

হজ্জ ও ওমরার রুকন বলতে ঐসব আমল উদ্দেশ্য, যেগুলি হজ্জ ও ওমরায় অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে এবং অন্য কোন আমল যেগুলির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।

ওমরার রুকন ৩টি। যথা: ইহরাম বাঁধা, ত্বওয়াফ করা এবং সা'ঈ করা। আর এই রুকনগুলি হজ্জেরও রুকন; তবে হজ্জের ক্ষেত্রে ৪র্থ আরেকটি রুকন যুক্ত হবে, তা হচ্ছে, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

ইহরাম অর্থ, হজ্জ শুরুর নিয়্যত করা। মনে মনে নিয়্যত না করলে ইহরাম সম্পন্ন হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

'প্রত্যেকটি কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে' *(বুখারী, হা/১; মুসলিম, হা/৪৯২৭, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত)*। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই

একমত পোষণ করেছেন যে, কেউ হজ্জের তালবিয়া পড়ার ইচ্ছা পোষণ করে ওমরার তালবিয়া পড়ে ফেললে অথবা ওমরার তালবিয়া পড়ার ইচ্ছা করে হজ্জের তালবিয়া পড়ে ফেললে তার অন্তরের নিয়্যতটাই ধর্তব্য হবে; মৌখিক উচ্চারণ নয়' *(ইজমা/৫৫)*।

এখানে ত্বওয়াফ (যা রুকন হিসেবে বর্ণিত হলো তা) দ্বারা ত্বওয়াফে ইফাদা বা হজ্জের ত্বওয়াফ উদ্দেশ্য, যা আরাফা এবং মুযদালিফা থেকে ফিরে এসে করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

'তারা যেন এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে' *(হজ্জ ২৯)*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করলাম। মুযদালিফা থেকে ফিরে কুরবানীর দিন ছফিইয়া ঋতুগ্রস্ত হয়ে গেলেন। একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে যা কামনা করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছফিইয়ার কাছ থেকে তাই কামনা করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উনিতো ঋতুগ্রস্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন «حَابِسَتُنَا هِيَ؟» 'সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে দিল?' তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে কুরবানীর দিনে ঋতুস্রাব আসার আগেই ত্বওয়াফে

ইফাদ্বা সম্পন্ন করে ফেলেছে। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা মক্কা ত্যাগ কর’ *(বুখারী, হা/১৭৩৩; মুসলিম, হা/৩২২৩)*।

এখানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি ‘সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে দিল?’ অর্থ হচ্ছে, সে পবিত্র হয়ে ত্বওয়াফে ইফাদ্বা সম্পন্ন করা পর্যন্ত কি আমাদেরকে মক্কাতে আটকিয়ে দিল? ইবনে ক্বুদামা (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘ত্বওয়াফে ইফাদ্বা হজ্জের একটি রুকন, এটি ব্যতীত হজ্জ পূর্ণ হবে না এবং এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য আছে বলে আমাদের জানা নেই। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾ [الحج: ٢٩]

‘তারা যেন এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে’ *(হাজ্জ ২৯)*। ইবনে আব্দুল বার্র (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হজ্জের ফরযসমূহের একটি, তাতে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই’ *(মুগনী, ৫/৩১১)*।

আর ওমরা পালনকারী মক্কায় গমন করে সর্ব প্রথম যে ত্বওয়াফ করে, সেটিই হচ্ছে ওমরার ক্ষেত্রে রুকন। বিদায়াতুল মুজতাহিদ প্রণেতা বলেন, ‘সবাই এ বিষয়ে একমত যে, ত্বওয়াফে ক্বুদূম অর্থাৎ ওমরার ত্বওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো ত্বওয়াফ

ওমরাকারীর উপর অপরিহার্য নয়' *(১/৩৪৪)*। ইবনে কুদামা (রহেমাহুল্লাহ) ত্বওয়াফে ইফাদ্বা হজ্জের রুকন একথা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, 'আর হজ্জ যেহেতু দুই ইবাদত (হজ্জ ও ওমরা) এর মধ্যে একটি, সেহেতু ওমরার মত সেখানেও ত্বওয়াফ একটি রুকন' *(আল-মুগনী, ৫/৩১২)*।

ওমরা (العمرة)-এর আভিধানিক **অর্থ:** সাক্ষাৎ, সফর, পরিদর্শন ইত্যাদি। পরিভাষায়, কা'বা ঘরের ত্বওয়াফ এবং ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের সাক্ষাৎকে 'ওমরা' বলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাতুল ক্বাযা ও জে'রানাহ-এর ওমরাতে কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করেন এবং ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেন। আমর ইবনে দীনার বলেন, 'আমরা ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) কে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি ওমরাতে কা'বা ঘরের ত্বওয়াফ করেছে, কিন্তু ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করে নি; সে কি স্ত্রী সহবাস করতে পারে?' জবাবে তিনি বললেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করে কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করেছেন, মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন এবং ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেই তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে' *(বুখারী, হা/১৭৯৩; মুসলিম, হা/২৯৯৯)*।

ওমরার ক্ষেত্রে সা‘ঈ করতে হবে ত্বওয়াফের পরে; যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওমরাতুল ক্বাযা ও জে‘রানাহ-এর ওমরাতে এবং ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর হাদীছে গত হয়ে গেছে। **আর তামাত্তু হজ্জ পালনকারীকে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা‘ঈ করতে হবে।** পক্ষান্তরে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী ত্বওয়াফে ক্বুদূম অথবা ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা‘ঈ করবে। যদি তিনি ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে সা‘ঈ না করে থাকেন, তবে অবশ্যই তাকে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা‘ঈ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ ﴾ [البقرة: ١٥٨]

‘নিঃসন্দেহে ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা কা‘বা ঘরে হজ্জ বা ওমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু’টি প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই’ *(বাক্বারাহ ১৫৮)*। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ»

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সা‘ঈ কর। কেননা সা‘ঈ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে’ *(দারাক্বুতনী, ২/২৫৫;*

দারাকুতনীর সূত্রে বায়হাক্বীও হাদীছটি বর্ণনা করেন, ৫/৯৭, মা'রূফ ইবনে মুশকান ব্যতীত দারাকুতনীর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (ثقات), মারূফ সম্পর্কে ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এ বলেন, তিনি 'ছদূক্ব' (صدوق) বা বিশ্বস্ত। অতএব, হাদীছটির সনদ 'হাসান'। ইমাম নববী (রহেমাহুল্লাহ) এটিকে 'হাসান' বলেছেন (মাজমূ, ৮/৮২) এবং মিয্যী ও ইবনু আব্দিল হাদী 'ছহীহ' বলেছেন। শায়খ আলবানী (রহেমাহুল্লাহ) প্রণীত 'ইরওয়াউল গালীল'-এর ১০৭২ নং হাদীছ দ্র:, এখানে হাদীছটির আরো কয়েকটি সনদ উল্লেখিত হয়েছে)। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

'ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ না করা পর্যন্ত আল্লাহ কারো হজ্জ বা ওমরা কোনটাই পূর্ণ করবেন না' *(বুখারী, হা/১৭৯০; মুসলিম, হা/৩০৮০)*। এই আছারটির শব্দগুলি ইবনে জারীর (রহেমাহুল্লাহ) সূরা বাক্বারাহ্‌র ১৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এভাবে উল্লেখ করেন, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করল না, সে মূলতঃ হজ্জই করল না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٥٨]

‘নিঃসন্দেহে ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম’ *(বাক্বারাহ ১৫৮)*। ইবনে জারীর (রহেমাহুল্লাহ)-এর উক্ত বর্ণনার সূত্র বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষ।

সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ তিনটি অর্থাৎ ইহরাম বাঁধা, ত্বওয়াফ করা এবং সা‘ঈ করা হজ্জ ও ওমরার রুকন। সা‘ঈর ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ বিদ্বানগণের নিকটে এটিও রুকন।

হজ্জের চতুর্থ রুকন হচ্ছে আরাফায় অবস্থান করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ﴾ [البقرة: ١٩٨]

‘অতঃপর যখন তোমরা আরাফা থেকে ফিরে আসবে’ *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। আর আরাফায় অবস্থানের পরেই তো সেখান থেকে ফিরে আসা হয়। আরাফায় অবস্থান এমন একটি রুকন, যা ছুটে গেলে হজ্জই হবে না। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়া‘মুর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফায় অবস্থান করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর নিকটে নাজ্‌দের কতিপয় লোক এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কেমন করে (আদায় করব)? তিনি বললেন,

«الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»

'আরাফায় অবস্থানই হচ্ছে হজ্জ। অতএব, যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের পূর্বে এখানে আসল, তার হজ্জ পূর্ণ হল' *(সুনানে আরবা'আহ, হাদীছের শব্দগুলি ইবনে মাজাহ্‌র, হা/৩০১৫; বুকাইর ইবনে আত্বা নামক বর্ণনাকারী ব্যতীত হাদীছটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষ, বুকাইর হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য (ثقة))*। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, আরাফায় অবস্থান করা ফরয। যার এখানকার অবস্থান ছুটে যাবে, তার হজ্জ নেই' *(আল-ইজমা/৬৪)*।

হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিবসমূহ

হজ্জ ও ওমরার ঐসব আমলকে ওয়াজিব বলা হয়, যেগুলি অবশ্যই পালনীয়; তবে সেগুলি পালন না করা হলে 'দম' (دم) দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। যার উপর দম ওয়াজিব হবে, সে তা থেকে খেতে পারবে না; বরং তা পুরোটাই হারামের দরিদ্রদেরকে খাওয়াতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ-ওমরার কোনো আমল ছেড়ে দিবে, সে দম দিবে' *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, ১/৪১৯, সনদ 'ছহীহ')*।

ওমরার ওয়াজিব ২টি এবং হজ্জের ওয়াজিব ৭টিঃ

১. মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীক্বাতসমূহের বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»

‘এসব এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরা করতে চায় এবং তারা ব্যতীত যারাই এসব এলাকা দিয়ে হজ্জ ও ওমরা করতে আসবে, এগুলি তাদের সকলের মীক্বাত। যারা এসব এলাকার ভেতরে বসবাস করে, তারা তাদের অবস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে; এমনকি মক্কাবাসী মক্কা থেকে’ *(বুখারী, হা/১৮৪৫; মুসলিম, হা/২৮০৪, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*। অতএব, হজ্জ ও ওমরা পালনেচ্ছু যে-ই এই মীক্বাতগুলির কোনো একটি অতিক্রম করবে, তাকেই সেই মীক্বাত থেকে অবশ্যই ইহরাম বাঁধতে হবে।

২. হজ্জ ও ওমরা থেকে হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডন করা অথবা চুল ছেটে ফেলা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: ٢٧]

‘আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায় মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তোমরা কাউকে ভয় করবে না’ *(ফাত্হ ২৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

‘আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যায়’ *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ»

‘হে আল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন’। ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! চুল কর্তনকারীদের কি হবে? তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন’। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! চুল কর্তনকারীদের কি হবে? তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন’। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! চুল কর্তনকারীদের কি হবে? তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি চুল কর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করুন’

(বুখারী, হা/১৭২৮; মুসলিম, হা/৩১৪৮, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত)।

মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা এবং মাথা মুণ্ডন করা বা সমস্ত মাথার চুল ছেটে ফেলা হজ্জ ও ওমরা উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াজিব।

৩. যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে, তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জের বিবরণ সম্বলিত জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে এসেছে,

«فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত (আরাফায়) অবস্থান করলেন' *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। আর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, 'তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখ। আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমার এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করব না' *(মুসলিম, হা/৩১৩৭, জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত)*।

৪. মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ [البقرة: ١٩٨]

‘অতঃপর যখন আরাফা থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ‘আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর’ *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। এখানে মাশ‘আরে হারাম অর্থ মুযদালিফা। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সকাল পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করেছেন। তবে তিনি দুর্বল নারী এবং বাচ্চাদেরকে শেষ রাতে মিনায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী, হা/১৬৭৬; মুসলিম, হা/৩১৩০, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে)*। বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেন *(বুখারী, হা/১৬৭৭; মুসলিম, হা/৩১২৬)*। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কতিপয় ওযরগ্রস্ত মানুষকে অনুমতি দেওয়ার অর্থই হচ্ছে, এখানে রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। কেননা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব না হলে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসত না।

৫. কুরবানীর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে বা পরে জামরাতুল আক্বাবায় এবং তাশরীক্বের দিনগুলিতে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

«رَمَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন সকালে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করেন। তবে এরপরের দিনগুলিতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে নিক্ষেপ করেন’ *(মুসলিম, হা/৩১৪১)*। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘কুরবানীর দিন মিনাতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল এবং তিনি বলছিলেন, কোনো অসুবিধা নেই। এক ব্যক্তি তাকে বললেন, আমি কুরবানীর পশু যবেহ করার আগেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ কর, সমস্যা নেই। লোকটি বললেন, সন্ধ্যার পরে কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি বললেন, সমস্যা নেই’ *(বুখারী, হা/১৭৩৫)*।

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, সূর্য ঢলে গেলেই কংকর নিক্ষেপ করতাম’ *(বুখারী, হা/১৭৪৬)*[1]।

আছেম ইবনে আদি (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন,

---

[1] এর দ্বারা জিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের পাথর নিক্ষেপের সময় বর্ণনা উদ্দেশ্য। [সম্পাদক]

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুর দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদেরকে মিনায় রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে ছাড় দিতেন। ফলে তাঁরা কুরবানীর দিন কংকর মারতেন এবং তৎপরবর্তী দুই দিনের কংকর একদিনে একসঙ্গে মেরে দিতেন' *(নাসা'ঈ, হা/৩০৬৯, সনদ ছহীহ)*। উক্ত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পশু দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদেরকে দুই দিনের কংকর একদিনে একসঙ্গে মারার অনুমতি দেওয়া এবং তাঁদের উপর থেকে কংকর নিক্ষেপের দায়িত্ব রহিত না হওয়াই প্রমাণ করে যে, কংকর মারা ওয়াজিব।

৬. বিলম্বকারীদের জন্য তাশরীক্বের তিন রাত এবং তাড়াহুড়া করে প্রস্থানকারীদের জন্য প্রথম দুই রাত মিনায় যাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। অতঃপর যে ব্যক্তি প্রথম দুই দিনে তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে

থেকে যাবে, তাঁর উপর কোন পাপ নেই। অবশ্য যারা ভয় করে' *(বাক্বারাহ ২০৩)*। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আইয়ামে তাশরীক্বের তিন রাতই মিনায় যাপন করেন এবং ১৩ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর মিনা ত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পানি পরিবেশনকারী এবং পশু দেখাশুনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তাশরীক্বের রাত্রিগুলি মিনায় না কাটানোর অনুমতি প্রদানই প্রমাণ করে যে, মিনায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্ত্বালিব হাজীদেরকে পানি পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাশরীক্বের রাত্রিগুলি মক্কায় কাটানোর অনুমতি চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেন' *(বুখারী, হা/১৬৩৪; মুসলিম, হা/৩১৭৭)*। পূর্বে উল্লেখিত আছেম ইবনে আদি (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছও মিনায় রাত্রি যাপন ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। অতএব, পানি পরিবেশনকারী এবং পশু দেখাশুনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মত যাদের মিনার বাইরে রাত্রি যাপনের অবশ্য প্রয়োজন দেখা দিবে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির আওতায় পড়বে। যেমন: নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ, সেনাবাহিনী, ডাক্তার প্রমুখ।

৭. বিদায়ী ত্বওয়াফ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ত্যাগের সময় বিদায়ী ত্বওয়াফ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘(মক্কায়) লোকদেরকে সর্বশেষ যে কাজটির আদেশ করা হয়েছে, তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ। তবে ঋতুবতীদের ক্ষেত্রে বিধান শিথিল করা হয়েছে’ *(বুখারী, হা/১৭৫৫; মুসলিম, হা/৩২২০)*। হাদীছটিতে ঋতুবতী মহিলাদেরকে বিদায়ী ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার অর্থই হচ্ছে এটি ওয়াজিব। প্রসূতি অবস্থায় পতিত মহিলারাও এই ছাড়ের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘লোকেরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল; অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিদায়ী ত্বওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে’ *(মুসলিম, হা/৩২১৯)*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বর্ণিত হাদীছে ছফিইয়া (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) ঋতুগ্রস্ত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সে কি আমাদেরকে মক্কায় আটকিয়ে দিল?’ অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানলেন যে, সে কুরবানীর দিনে ত্বওয়াফে ইফাদ্বা সম্পন্ন করেছে, তখন বললেন, ‘তাহলে এখন তোমরা মক্কা ছাড়তে পার’ *(বুখারী, হা/১৭৩৩; মুসলিম, হা/৩২২৩)*। হাদীছটি হজ্জ ও ওমরার রুকন উল্লেখ করার সময় গত হয়ে গেছে।

হজ্জ ও ওমরার মুস্তাহাবসমূহ

হজ্জের ঐসব কর্মকে মুস্তাহাব বলে, যেগুলি নেকী প্রাপ্তির আশায় হাজীদের বাস্তবায়ন করা উচিৎ; তবে তা অপরিহার্য নয়। কোন হাজী এগুলি ছেড়ে দিলে যেমনিভাবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে না, তেমনি সে পাপীও হবে না। তবে অপছন্দ এবং অবজ্ঞাবশতঃ ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

'সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, হা/৫০৬৩; মুসলিম, হা/১৪০১)*। হাদীছটিতে সুন্নাত বলতে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত ফরয, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাবসমূহ উদ্দেশ্য। হজ্জের অনেকগুলি মুস্তাহাব রয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমনকারী কর্তৃক প্রথম ত্বওয়াফে 'রমল' এবং 'ইযত্বিবা' করা। ত্বওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা অথবা ইহার দিকে ইশারা করা এবং আল্লাহু আকবার

বলা। রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা। ফরয, ওয়াজিব বা নফল যে কোন ত্বওয়াফের পরে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা এবং যমযম পানি পান করা। ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে আরোহণ করে ক্বিবলামুখী হয়ে দো‘আ করা। সা‘ঈর সময় দুই সবুজ বাতির মাঝখানে জোরে চলা। তারবিয়ার দিনে অর্থাৎ ৮ তারিখে মিনায় অবস্থান করা। প্রথম এবং দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর হাত তুলে দো‘আ করা। কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর দেওয়া ইত্যাদি।

হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার সময়-কাল এবং মীক্বাতসমূহ

হজ্জ ও ওমরার মীক্বাতসমূহ বলতে ঐসব স্থানকে বুঝায়, যেসব স্থান দিয়ে হজ্জ ও ওমরা পালনকারী অতিক্রম করলে তার জন্য সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা অপরিহার্য হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই মীক্বাতসমূহের বিশদ বর্ণনা এসেছে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীর জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীর জন্য জুহ্‌ফা, নাজ্‌দবাসীর জন্য ক্বারনুল মানাযিল এবং ইয়েমেনবাসীর জন্য ইয়ালামলামকে মীক্বাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। (তিনি বলেছেন), এসব এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরা করতে চায় এবং তারা ব্যতীত যারাই এসব এলাকা দিয়ে হজ্জ ও ওমরা করতে আসবে, এগুলি তাদের সকলের মীক্বাত। যারা এসব এলাকার ভেতরে বসবাস করে, তারা তাদের অবস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে;

এমনকি মক্কাবাসী মক্কা থেকে’ *(বুখারী, হা/১৫২৪; মুসলিম, হা/২৮০৩)*। মক্কাবাসী কর্তৃক তাদের বাড়ী থেকে ইহরাম বাঁধার বিষয়টি শুধুমাত্র হজ্জের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা ওমরা করতে হলে তাদেরকে হারাম এলাকার বাহির থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) কে তান‘ইমে ইহরাম বাঁধার জন্য পাঠিয়েছিলেন *(বুখারী, হা/১৭৬২; মুসলিম, হা/২৯১০, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত)*। উপরোক্ত হাদীছ দু’টিতে মক্কাবাসী এবং তাদের মত যারা, তাদের সবাইকে হজ্জ-ওমরায় হারাম এবং হালাল এলাকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে বলা হয়েছে। এই মীক্বাত চারটি ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বর্ণিত হাদীছেও এসেছে *(বুখারী, হা/১৩৩; মুসলিম, হা/২৮০৫)*। আর পঞ্চম মীক্বাত হচ্ছে ‘যাতু ইর্ক্ব’, ইহা ইরাকবাসীদের মীক্বাত। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বর্ণিত হাদীছে উপরোক্ত মীক্বাত চতুষ্টয়ের সাথে এই পঞ্চম মীক্বাতও উল্লেখিত হয়েছে *(নাসা‘ঈ, হা/২৬৫৬, সনদ ‘ছহীহ’, বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (ثقات))*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বর্ণিত অন্য হাদীছে শুধু এই মীক্বাতটির কথাও এসেছে, ‘রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য যাতু ইর্ক্বকে মীক্বাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৭৩৯, ইমাম আবূ দাঊদের উস্তাদের*

পর থেকে শুরু করে সনদের বাক্বী সবাই ইমাম নাসা'ঈর সনদের রাবী)। তবে ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছে বর্ণিত আছে, 'কূফা ও বাছরা বিজিত হলে এসব এলাকার লোকজন ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর নিকটে এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্‌দবাসীর জন্য ক্বারনুল মানাযিলকে মীক্বাত হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেটি আমাদের রাস্তায় না পড়ায় সেখানে যেতে আমাদের কঠিন হয়। তিনি বললেন, তোমরা দেখ, তোমাদের রাস্তার কোন স্থানটি ক্বারনুল মানাযিল বরাবর পড়ে। অতঃপর তিনি তাদের জন্য যাতু ইর্‌ক্ব নির্ধারণ করে দিলেন' *(বুখারী, হা/১৫৩১)*। এই হাদীছের ব্যাখ্যা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যাতু ইর্‌ক্বকে ইরাকবাসীর মীক্বাত হিসাবে নির্ধারণ করার মারফূ হাদীছটি ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর জানা না থাকায় তিনি ইজতেহাদ করে তাদের জন্য এটি নির্ধারণ করে দেন এবং তাঁর ইজতেহাদ হক্বের সাথে হুবহু মিলে যায়।

যে ব্যক্তি উক্ত মীক্বাতসমূহের কোনোটিই অতিক্রম করবে না, সে মীক্বাত বরাবর পৌঁছলে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে, চাই সে স্থল পথ দিয়ে আসুক অথবা আকাশ পথ বা পানি পথ দিয়ে আসুক। কেউ মীক্বাতে পৌঁছার আগে ইহরাম বাঁধলে তার

ইহরামও শুদ্ধ হবে, তবে তা অনুত্তম বিবেচিত হবে। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি মীক্বাতে পৌঁছার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে, সে মুহরিম হিসাবে গণ্য হবে' *(আল-ইজমা/৫৪)*।

যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার ইচ্ছা ছাড়াই মীক্বাত দিয়ে অথবা মীক্বাত বরাবর স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে, তার জন্য সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা অপরিহার্য নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী «مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» 'যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা করতে চায়' প্রমাণ করে যে, এই হুকুম হজ্জ বা ওমরা পালনকারী ব্যতীত অন্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

আর যে ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত মীক্বাত থেকে ইহরাম না বেঁধে তা অতিক্রম করে চলে আসে; যেমন কোন ইয়েমেনী যদি তার মীক্বাত ইয়ালামলাম অতিক্রম করে প্রথমে মদীনায় আসে অথবা কেউ যদি বিমান যোগে জেদ্দায় পৌঁছে সেখান থেকে মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সরাসরি মদীনায় আসে, অতঃপর মদীনাবাসীর মীক্বাত যুল-হুলায়ফা থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তাতে কোন সমস্য নেই। কেননা সে তার মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধার ইচ্ছাই করে নি; বরং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায়

আসার পথে সে তার মীক্বাত অতিক্রম করেছে এবং পরবর্তীতে মদীনার মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দায় পৌঁছল এবং সেখান থেকে তাকে সরাসরি মদীনায় আসার জন্য বলা হল, সে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি হজ্জের কার্যাবলী শুরু করেছে, তার জন্য তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*।

ইহরাম বাঁধার সময়-কাল বলতে ঐসব মাসকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলিতে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধা যায়। বছরের সব কয়টি মাসেই ওমরা করা যায়। কেননা কোনো মাসকে ওমরার জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার কোন দলীল নেই। তবে হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে। আর সেগুলি হচ্ছে, শাওয়াল, যুল-ক্বা'দাহ এবং যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

'হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, তার জন্য হজ্জে স্ত্রী সহবাস করা, অশোভন কোন কাজ করা এবং ঝাগড়া-বিবাদ করা জায়েয নয়' *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত একটি আছারে[2] এই মাসগুলির বর্ণনা এসেছে, ইমাম বুখারী আল্লাহ্র বাণী: 'হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে' অনুচ্ছেদে আছারটিকে 'মু'আল্লাক্ব'[3] হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটিকে ছহীহ ও 'মাওছূল[4]' সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং হাফেয যাহাবী তাঁকে সমর্থন

---

[2] আছার বলতে বুঝায়, সাহাবা কিংবা তাবে'ঈদের কোনো বাণীকে। যা তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় কিংবা এতদসংক্রান্ত কোনো ফিকহী দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করেছেন। [সম্পাদক]

[3] মু'আল্লাক অর্থ সে হাদীস বা বর্ণনা যার সনদ যার থেকে তা বর্ণিত হয়েছে তার কাছ থেকে পরস্পরা দ্বারা সংযুক্ত হয় নি। যেমন ইমাম বুখারী বললেন যে, 'ইবন উমর এটা বলেছেন'। অথচ ইমাম বুখারী ও ইবনে উমরের মাঝে অনেক বর্ণনাকারী রয়েছেন, কারণ ইমাম বুখারী ও ইবন উমরের মাঝে বহু বছরের পার্থক্য রয়েছে। [সম্পাদক]

[4] মাওছূল হচ্ছে সে হাদীস বা বর্ণনা, যার সনদ যার থেকে তা বর্ণিত হয়েছে তার কাছ থেকে বর্ণনা পরস্পরা দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। [সম্পাদক]

করেছেন। হাফেয ইবনে কাছীর (রহেমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে আছারটিকে ওমর, আলী, ইবনে মাসঊদ, ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'হজ্জের মাসগুলিতে ছাড়া অন্য মাসে হজ্জের ইহরাম বাঁধা যাবে না। কেননা হজ্জের নিয়ম হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহে ইহার ইহরাম বাঁধা' *(ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/২৫৯৬, বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ)*। ইমাম বুখারী 'আল্লাহ্‌র বাণী: হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে' অনুচ্ছেদে আছারটিকে 'মু'আল্লাক্ব' হিসাবে উল্লেখ করেছেন; তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'সুন্নাত হচ্ছে, হজ্জের মাসসমূহ ছাড়া অন্য মাসে হজ্জের ইহরাম বাঁধা যাবে না'। আর ছাহাবীর উক্তি (من السنة) 'সুন্নাত হচ্ছে..' মারফূ[5] হাদীছের মত। অতএব, শাওয়াল মাসের প্রথম রাত থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধার বৈধতা শুরু হয় এবং কুরবানীর দিন ফজর

---

[5] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে হাদীসের সনদ পৌঁছেছে, সেটাকে মারফূ' হাদীস বলা হয়।

অর্থাৎ সাহাবী যখন বলেন, এটা সুন্নাত। তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে যে এটা রাসূলের সুন্নাত, বা প্রদর্শিত পথ। সেটা ফরয কিংবা ওয়াজিবও হতে পারে। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যে সুন্নাত (ফরয, ওয়াজিবের চেয়ে কম তাগিদসম্পন্ন) সে অর্থে নয়। [সম্পাদক]

উদয় হওয়ার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। শাওয়াল এবং যুল-ক্বা‘দাহ ৩০ দিনে হলে মোট দিনের সংখ্যা হয় ৭০ দিন, উক্ত মাসদ্বয়ের কোন একটি ২৯ দিনে হলে হয় ৬৯ দিন এবং উভয় মাস ২৯ দিনে হলে হয় ৬৮ দিন। ঈদুল ফিতরের রাত হচ্ছে প্রথম রাত এবং ঈদুল আযহার রাত হচ্ছে শেষ রাত। ঈদুল আযহার পরে হজ্জের কতিপয় কাজ বাক্বী থাকলেও তা এই বক্তব্যের সাথে মোটেও সাংঘর্ষিক নয়। কেননা এই মাসগুলিতে হজ্জের ইহরাম বাঁধা উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]

‘এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধবে..’।

কুরবানীর রাতে ফজর উদিত হওয়ার পরে আরাফায় অবস্থানের সময় শেষ হওয়ার কারণে হজ্জের ইহরাম বাঁধার আর কোনো সুযোগই থাকে না।

উল্লেখ্য যে, হজ্জের মাসসমূহ পূর্ণ তিন মাস না হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাতে কোন সমস্যাও নেই। এমন ব্যবহার কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে এসেছে। যেমন: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ﴾ [التحريم: ٤]

‘তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে’ *(তাহরীম ৪)*। আয়াতে দু’জনের অন্তরের কথা বলা হলেও (قلوب) ‘অন্তরসমূহ’ ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ۝٧٨ ﴾ [الانبياء: ٧٨]

‘আর স্মরণ করুন দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল’ *(আম্বিয়া ৭৮)*। আয়াতে দু’জন বুঝাতে বহু বচনের সর্বনাম (لِحُكۡمِهِمۡ) ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতেও দু’জন বুঝাতে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ [النساء: ١١]

‘অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ’ *(নিসা ১১)*। কেননা মৃতের দুই বা ততোধিক ভাই থাকলে মা তিন ভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এখানে দুই ভাই বুঝাতে বহু বচন (إِخۡوَةٞ) ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে প্রথম দুই দিনে চলে যাবে, তার কোনো পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ২০৩)*। এখানে এক দিন এবং অর্ধ দিন বুঝাতে দ্বি-বচন (يَوْمَيْنِ) ব্যবহার করা হয়েছে।

আর কেউ হজ্জের মাসসমূহের বাইরে অন্য মাসে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে তার ইহরাম শুদ্ধ হবে; তবে তা ওমরার ইহরাম হিসাবে গণ্য হবে[6]। অতএব, সে ত্বওয়াফ এবং সা'ঈ করে মাথা মুণ্ডন বা সমস্ত মাথার চুল ছেটে হালাল হয়ে যাবে। এই ওমরার সাথে তামাত্তু হজ্জের কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকবে না[7]। কেননা এই মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে ওমরার ইহরাম বাঁধে নি।

---

[6] অর্থাৎ সেটি উমরার ইহরামে রুপান্তরিত হয়ে যাবে। হজ্জের ইহরাম থাকবে না। [সম্পাদক]

[7] অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করতে হলে হজের মাসেই উমরার ইহরাম হতে হবে। হজের মাসের বাইরে ইহরাম করলে সেটি শুধু উমরা হবে। যেমন কেউ রমযানের শেষ রাত্রিতে উমরা করল, পরে মক্কায় থেকে গেল, তাহলে সে যদি আর উমরা না করে তবে সে মুফরিদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তামাত্তু হজ করতে হলে তাকে শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের মধ্যেই আরেকটি উমরার ইহরাম করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি শাওয়াল মাস আসার পর উমরা করে, আর সে যদি নিজ দেশে ফিরে না যায়, তাহলে সে বছর হজ্জ করলেই সে তামাত্তু হজ্জকারী বিবেচিত হবে। [সম্পাদক]

আর সম্মানিত মাস যার উল্লেখ মহান আল্লাহ তাঁর বাণীতে করেছেন,

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ﴾ [التوبة: ٣٦]

'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারটি। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত' *(তাওবাহ ৩৬)*। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত পবিত্র মাস চারটি হচ্ছে, যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ, মুহাররম এবং রজব; তিনটি ধারাবাহিক এবং চতুর্থটি পৃথক। কারণ রজব মাস বছরের মাঝখানের একটি মাস, এটি ধারাবাহিকতার দিক থেকে সম্মানিত অন্যান্য মাসসমূহ থেকে আলাদা। যুল-হিজ্জাহ মাসে হজ্জ আদায় করা হয় এবং এর আগের এক মাসে মানুষ হজ্জে যায় আর পরের এক মাসে হজ্জ থেকে ফিরে আসে। মুহাররম এবং রজব সম্মানিত মাস হলেও এতদুভয় হজ্জের মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। যুল-হিজ্জাহ মাস পুরোটাই সম্মানিত মাস এবং এর প্রথম দশ দিন হজ্জের মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। জাহেলী যুগেও আরবরা সম্মানিত এই চার মাসকে সম্মান করত এবং এই মাসগুলিতে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। সেকারণে আব্দুল ক্বায়সের প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে এমন

নির্দেশ তলব করেছিলেন, যা তারা তাদের গোত্রের লোকদেরকে বলবে এবং এর বিনিময়ে তারা জান্নাতে যেতে পারবে; তারা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সম্মানিত মাসসমূহ ব্যতীত অন্য মাসে আমরা আপনার কাছে আসতে পারব না। কেননা আমাদের মাঝে এবং আপনার মাঝে মুদ্বার গোত্রের কাফেরদের বসতি রয়েছে' *(বুখারী, হা/৫৩; মুসলিম, হা/১১৫)*।

আবু বাকরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছে সম্মানিত এই মাসগুলির বিবরণ এসেছে *(বুখারী, হা/৩১৯৭; মুসলিম, হা/৪৩৮৩)*।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

হজ্জ ও ওমরার রুকন সম্পর্কে আলোচনায় এসেছে যে, ইহরাম হচ্ছে, হজ্জ বা উমরার কার্যাবলী শুরু করার নিয়্যত করা। আর এ দু'টোতে প্রবেশের নিয়্যতকে ইহরাম বলার কারণ হচ্ছে, এর মাধ্যমে এমন কতিপয় জিনিস নিষিদ্ধ হয়, যেগুলি এই নিয়্যতের পূর্বে হালাল ছিল। ছালাতের তাকবীরে তাহ্‌রীমার ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটি হয়। কেননা এর মাধ্যমে এমন কিছু বিষয় হারাম হয়ে, যেগুলি এর পূর্বে হালাল ছিল। হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর যে বিষয়গুলি হারাম হয়ে যায়, সেগুলিকে **ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ** বলে। আর সেগুলি হচ্ছে ৯টি: **পশম**

উঠানো/কাট-চাট করা, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, পুরুষ কর্তৃক মাথা ঢেকে রাখা, পুরুষের জন্য সেলাইকৃত পোষাক পোষাকের স্বীয় আকৃতিতে পরিধান করা, স্থলের পশু-পাখি শিকার করা, বিবাহ সম্পন্ন করা, স্ত্রী সহবাস করা এবং যৌন উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা।

এক. পশম উঠানো: মাথার চুল, গোঁফ, নাভীর নীচের লোম, বগলের লোম বা শরীরের যে কোনো স্থানের পশম যে কোনো উপায়ে উঠানো। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

'আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে যায়। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে ছওম পালন করবে কিংবা ছাদাক্বা করবে অথবা কুরবানী করবে' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। মাথার চুলের মত সমস্ত শরীরের যে কোনো স্থানের পশমও এই বিধানের আওতায় পড়বে। কেননা এগুলির সবই শৌখিনতার অন্তর্ভুক্ত[8]।

---

[8] আর ইহরাম অবস্থায় শৌখিনতার বিষয়গুলো নিষিদ্ধ। [সম্পাদক]

তবে দাড়ি চাঁছা বা ছাটা ইহরাম এবং হালাল উভয় অবস্থায় হারাম। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى»

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর; গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' *(বুখারী, হা/৫৮৯২; মুসলিম, হা/৬০২)*। বুখারীতে ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছের শব্দ এসেছে এভাবে, «وَوَفِّرُوا اللِّحَى» 'দাড়ি বেশী কর'। একই ছাহাবী বর্ণিত মুত্তাফাক্ব আলাইহ্-এর হাদীছে শব্দ এসেছে এভাবে, «وَأَعْفُوا» 'দাড়ি বড় হতে দাও' *(বুখারী, হা/৫৮৯৩; মুসলিম, হা/৬০০)*। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

'তোমরা গোঁফ ছাঁটো, দাড়ি ছেড়ে দাও; (এর মাধ্যমে) তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর' *(মুসলিম, হা/৬০৩)*। উক্ত হাদীছ দু'টিতে দাড়ি ছাড়ার আদেশ জ্ঞাপক চারটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে: الإرخاء، الإيفاء، الإعفاء এবং التوفير । আমাদের শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহেমাহুল্লাহ) বলেন,

‘বর্তমান যুগে মুছীবত প্রকট আকার ধারণ করেছে। কারণ বহু মানুষ আজ এই সুন্নাতের[9] বিরোধিতা করে এবং দাড়ির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। তারা কাফের এবং মহিলাদের সাতে সাদৃশ্য বজায় রেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজেঊন’। আমাদের শায়খ মুহাম্মাদ আমীন শানক্বীত্বী (রহেমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘আযওয়াউল বায়ান (৪/৬৩০)’-এ সূরা ত্ব-হা-এর তাফসীর করতে গিয়ে হারূন এবং মূসা (‘আলাইহিস্‌সালাম)-এর আলোচনার সময় বলেন, ‘পবিত্র কুরআন দাড়ি ছাড়ার প্রমাণ বহন করে এবং দাড়ি ছিল রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ঘন দাড়ি বিশিষ্ট; অথচ তিনি ছিলেন সুন্দরতম মানুষ। যেসব মহা পুরুষ কিসরা এবং কায়ছারের ধন-ভাণ্ডার গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবী যাঁদের করতলগত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কেউ দাড়ি ছাটা বা চাঁছা ছিলেন না’।

---

[9] শাইখের উদ্দেশ্য রাসূলের সুন্নাত বলা, ফিকহী সুন্নাত বলা নয়। কারণ, দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে শাইখ ইবন বাযের আলাদা গ্রন্থ রয়েছে। [সম্পাদক]

দুই. নখ কাটা: ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য নখ কাটা নিষিদ্ধ’ *(আল-ইজমা/৫৭)*। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ ﴾ [الحج: ٢٩]

‘এরপর তারা যেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়’ *(হজ্জ ২৯)*। হাফেয ইবনে কাছীর (রহেমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, ‘আলী ইবনু আবী ত্বলহা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, ‘(এর অর্থ হচ্ছে), মাথা মুণ্ডন করা, সাধারণ পোষাক পরা এবং নখ কাটা[10]। আত্বা এবং মুজাহিদ (রহেমাহুল্লা-হ) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা‘ব (রহেমাহুল্লাহ)ও এমনটি বলেছেন’। উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বর্ণিত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظفارِهِ»

---

[10] আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুহরিম ব্যক্তি এগুলো করবে না, তারপর যখন হালাল হবে, তখন যেন এগুলো করে নিজেকে দৈহিক ময়লা থেকে মুক্ত করে। আর পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে কা‘বা শরীফের তাওয়াফ করবে।[সম্পাদক]

‘যখন তোমরা যুল-হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে যেন তার চুল এবং নখ না কাটে’ *(মুসলিম, হা/৫১১৯)*। কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির তুলনায় মুহরিম ব্যক্তি এই নিষেধাজ্ঞার অধীনে পড়ার অধিক উপযুক্ত।

তিন. সুগন্ধি ব্যবহার করা: মুহরিম ব্যক্তি শরীরে অথবা কাপড়ে কোনো প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর হাদীছে এসেছে,

«وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ»

‘তোমরা যাফরান এবং ওয়ার্স (এক প্রকার উদ্ভিদ, যাতে সুগন্ধি রয়েছে) রঞ্জিত কাপড় পরবে না’ *(বুখারী, হা/১৫৪২; মুসলিম, হা/২৭৯১)*। ইয়া‘লা ইবনে উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, জে‘রানাতে সুগন্ধি মিশ্রিত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেউ সুগন্ধি মিশ্রিত জুব্বা পরে ওমরার ইহরাম বাঁধলে, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন,

«أَمَّا الطِّيبُ الَّذِى بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِى حَجِّكَ»

'তোমার গায়ের সুগন্ধি তুমি তিনবার ধুয়ে ফেলো এবং তোমার জুব্বা খুলে ফেলো। অতঃপর তোমার ওমরার জন্য তদ্রূপ কর, যেরূপ তুমি তোমার হজ্জের জন্য করে থাক' *(বুখারী, হা/৪৩২৯; মুসলিম, হা/২৭৯৮)*। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'এক ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন; এমতাবস্থায় তার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দিলে তিনি মারা গেলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»

'তোমরা পানি এবং বরই পাতা দিয়ে তাকে গোসল করাও। ইহরামের কাপড় দু'টি দিয়েই তার কাফন সম্পন্ন কর। তার দেহে কোন সুগন্ধি লাগাইও না এবং তার মাথা ঢেকো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পড়া অবস্থায় উঠানো হবে' *(বুখারী, হা/১৮৫১; মুসলিম, হা/২৮৯২)*।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যে, মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা এটি শৌখিনতার অন্তর্ভুক্ত। তবে মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পূর্বে তার শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে; কাপড়ে নয়। ইহরাম বাঁধার

পর সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা শরঈ ক্বায়দা হচ্ছে, يَجُوْزُ فِيْ الْاِسْتِدَامَةِ مَا لاَ يَجُوْزُ فِي الْاِبْتِدَاءِ **'কিছু বিষয় অব্যাহত রাখা জায়েয হলেও নতুনভাবে শুরু করার ক্ষেত্রে তা জায়েয নয়'**। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

'ইহরাম বাঁধার সময় ইহরামের উদ্দেশ্যে এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম' *(বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসলিম, হা/২৮৪১)*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) আরো বলেন,

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفْرِقِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম থাকা অবস্থায় আমি যেন তাঁর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি' *(বুখারী, হা/২৭১; মুসলিম, হা/২৮৩২)*।

চার. মুহরিম ব্যক্তি কর্তৃক মাথা বা মুখের সাথে লেগে থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা: ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছে এসেছে,

«لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ»

'মুহরিম ব্যক্তি জামা এবং পাগড়ী কোনটাই পরবে না' *(বুখারী, হা/১৫৪২; মুসলিম, হা/২৭৯১)*। উটের আঘাতে যে ব্যক্তি ঘাড় ভেঙ্গে মারা যান, তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'তোমরা পানি এবং বরই পাতা দিয়ে তাকে গোসল করাও। ইহরামের কাপড় দু'টি দিয়েই তার কাফন সম্পন্ন কর। তার দেহে কোনো সুগন্ধি লাগাইও না এবং তার মাথা ঢেকো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পড়া অবস্থায় উঠানো হবে' *(মুসলিম, হা/২৮৯৬)*। তবে মাথা বা মুখের সাথে লেগে থাকে না এমন কিছু দ্বারা ছায়া গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: ছাতা, গাড়ীর ছাদ, কাপড়, তাঁবু ইত্যাদি। কেননা জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড় দ্বারা ছায়া দেওয়া হয়েছিল *(মুসলিম, হা/৩১৩৮, উম্মুল হুছায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত)*। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জের বিবরণ সম্বলিত জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নামিরাতে যে তাঁবু খাটানো হয়েছিল, তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার মধ্যেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন’ *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

পাঁচ. পুরুষ কর্তৃক সারা দেহ আবৃত করে- এমন সেলাই করা পোষাক পোষাকের স্বীয় আকৃতিতে পরা, যেমন: জামা; অথবা শরীরের কিছু অংশ আবৃত করে- এমন সেলাই করা পোষাক স্বীয় আকৃতিতে পরা, যেমন: পায়জামা, চামড়ার মোজা, কাপড়ের মোজা, গেঞ্জী ইত্যাদি। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ পোষাক পরিধান করবে?’ তিনি বললেন,

«لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»

‘সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, মাথাওয়ালা জামা, মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো যদি সেণ্ডেল না থাকে, তাহলে সে টাখনূর নীচ পর্যন্ত মোজা কেটে ফেলে তা পায়ে দিবে। অনুরূপভাবে তোমরা যাফরান এবং ওয়ার্‌স (এক প্রকার উদ্ভিদ) রঞ্জিত কাপড় পরবে না’ *(বুখারী, হা/১৫৪২; মুসলিম, হা/২৭৯১)*। হাদীছের ভাষ্য অনুসারে সেন্ডেলের মতই বিধান হবে টাখনূর নীচ

পর্যন্ত মোজার। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে টাখনুর নিচে মোজা কাটার যে নির্দেশ এসেছে তা ছিল মদীনা থাকা অবস্থায়; কিন্তু তিনি আরাফাতে থাকা অবস্থায় না কেটেই মোজা পরার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, আমি আরাফাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»

‘যার সেণ্ডেল নেই, সে যেন মোজা পরে। অনুরূপভাবে কেউ যদি পরনের কাপড় না পায়, তাহলে সে যেন পায়জামা পরে; এই হুকুম মুহরিমের জন্য’ *(বুখারী, হা/১৮৪১; মুসলিম, হা/২৭৯৪)*। তাঁর এই খুৎবা সব জায়গার হাজী শুনেছিলেন। অতএব, এই হাদীছ দ্বারা ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বর্ণিত মোজা (টাখনুর নিচ থেকে) কেটে ফেলার হাদীছটি মানসূখ।

মুহরিম তার পরনের কাপড়ের পার্শ্ব সূতা দিয়ে বাঁধতে পারে বা বেল্ট বাঁধতে পারে। অনুরূপভাবে সেলাই করা মানি ব্যাগ, সেলাই করা সেণ্ডেলও ব্যবহার করতে পারে। পরনের কাপড় এবং গায়ে দেওয়ার চাদরের পার্শ্ব সেলাই দ্বারা আটকানো থাকলে অথবা পরনের কাপড় বা গায়ের চাদরের কোনো একটি

দুই টুকরা কাপড়ের সমন্বয়ে সেলাইয়ের মাধ্যমে তৈরীকৃত হলেও তা পরা যাবে। কেননা এখানে সেলাই করা পোষাক পরিধান থেকে নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে পোষাক তার স্বাভাবিক আকৃতিতে পরা হয়। যেমন: জামা, পায়জামা। অতএব, যদি কেউ হজ্জ বা ওমরার ইচ্ছা নিয়ে মীক্বাত দিয়ে যায় এবং তার কাছে পরনের কাপড় এবং গায়ের চাদর না থাকে, তাহলে সে তার জামাকে পরনের কাপড়ের মত করে পরতে পারে, যদি তা দ্বারা তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সম্ভব হয়। অনুরূপ আরেকটি জামা বা পায়জামাকে চাদরের মত করে গায়ে দিতে পারে অথবা পরনের কাপড় এবং গায়ের চাদর না পাওয়া পর্যন্ত পায়জামা পরতে পারে এবং জামাকে গায়ের চাদরের মত করে গায়ে দিতে পারে।

অনুরূপভাবে মুহরিম পুরুষ আংটি, ঘড়ি ইত্যাদি পরতে পারে। যেমন: কেউ প্রয়োজনে তার হাঁটুতে বা গোছায় কাপড় অথবা অন্য কিছু বাঁধতে পারে।

মহিলা মানুষ শরী'আতসম্মত স্বাভাবিক যে কোন পোষাক পরতে পারে। হাত মোজা এবং নেক্বাবসহ মুখমণ্ডলের মাপে তৈরীকৃত অন্যান্য কাপড় ছাড়া তার জন্য অন্য কোন পোষাক নিষেধ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلَا تَتَنَقَّبْ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»

'মুহরিম মহিলা মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করবে না এবং হাত মোজা পরবে না' *(বুখারী, হা/১৮৩৮, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*। তবে বেগানা পুরুষের উপস্থিতিতে সে তার কাপড় দ্বারা হাত এবং ওড়না দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে দিবে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»

'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালীন সময় আরোহী পথযাত্রীরা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। তারা আমাদের বরাবর পৌঁছলে আমরা আমাদের মাথার বড় চাদর টেনে মুখমণ্ডলের উপরে ঝুলিয়ে দিতাম এবং তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে গেলে আবার মুখ খুলে দিতাম' *(আবূ দাঊদ, হা/১৮৩৩, হাদীছটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে)*। দারাক্বুতনী উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে হাদীছটি *(হা/২৭৬৪)* বর্ণনা করেছেন, এই সনদেও আগের হাদীছের সনদের সেই দুর্বল রাবী রয়েছে; সুনানে সা'ঈদ ইবনে মানছূর-এ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক্ব

ছহীহ সনদে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত হাদীছও উক্ত হাদীছকে শক্তিশালী করে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«تَسْدِلُ الْمَرْأَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»

'মহিলা তার মাথার চাদর টেনে মুখমণ্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিবে' *(ফাৎহুল বারী, ৩/৪০৬)*। এর আরেকটি 'শাহেদ[11]' (شاهد) রয়েছে, যেটি ইমাম মালেক (রহেমাহুল্লাহ) ফাতেমা বিনতুল মুনযির (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণনা করেন। ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»

'আসমা বিনতে আবূ বকর ছিদ্দীক্ব-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম' *(মুওয়াত্ত্বা, ১/৩২৮)*। হাদীছটি ইমাম হাকেমও বর্ণনা করেন; আসমা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, 'পুরুষদের থেকে আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম এবং এর পূর্বে ইহরাম অবস্থায় আমরা মাথা আচড়াতাম' *(মুস্তাদরাক, ১/৪৫৪, হাকেম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটি ছহীহ, কিন্তু তাঁরা এটি বর্ণনা*

---

[11] শাহেদ বলা হয়, একই অর্থে অন্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে।[সম্পাদক]

করেননি; হাফেয যাহাবী (রহেমাহুল্লাহ) এই তাঁকে সমর্থন করেছেন)।

ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, মহিলা সেলাইকৃত সব ধরনের পোষাক এবং মোজা পরতে পারে। সে তার মাথা এবং চুল ঢেকে রাখতে পারে। সে তার মুখমণ্ডলের উপর একটি কাপড় ঝুলিয়ে দিবে, যাতে সে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিগোচর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে' *(ফাৎহুল বারী, ৩/৪০৬)*। এ বক্তব্যের পক্ষে ইবনে আব্দুল বার্র (রহেমাহুল্লাহ)ও ইজমা উল্লেখ করেছেন *(আত-তামহীদ, ১৫/১০৮)*। চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর শুরুর দিকে মহিলাদের বেপর্দা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা বেগানা পুরুষ থেকে তাদের মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখত। হাফেয ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'পূর্বে এবং বর্তমানে বেগানা পুরুষ থেকে মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢাকার অভ্যাস অব্যাহত রয়েছে' *(ফাৎহুল বারী, ৯/৩২৪)*।

কেউ অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ উক্ত নিষিদ্ধ ৫টি বিষয়ের কোনটি করে ফেললে তাতে কোন সমস্যা নেই। তবে অজ্ঞ ব্যক্তি জানার পরে এবং ভুলকারী স্মরণ হলে দ্রুত পদক্ষেপ নিবে; সেলাইকৃত পোষাক পরে থাকলে খুলে ফেলবে, মাথা ঢাকলে মাথা

আলগা করে ফেলবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকলে তা দূর করবে। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলি করলে সে একদিকে যেমন পাপী হবে, অন্যদিকে তেমনি তার উপর ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে। তবে প্রয়োজনের তাকীদে কেউ সেগুলি করলে সে গোনাহগার হবে না বটে, তবে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে। অবশ্য সুগন্ধির ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কেননা সুগন্ধি ব্যবহার মানুষের যরূরী কোনো বিষয় নয়। উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের ফিদ্ইয়া হচ্ছে, ছাগল যবেহ করা বা মাথাপিছু আধা 'ছা' হারে ছয়জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তিন দিন ছওম পালন করা। এ তিনটির যে কোন একটি বেছে নেওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

'তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিংবা মাথায় যদি কষ্টদায়ক কিছু থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে ছওম পালন করবে, কিংবা ছাদাক্বা করবে, অথবা কুরবানী করবে' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। ছাহাবী কা'ব ইবনে উজরা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত হাদীছ উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর মাথার উকুন তাঁকে কষ্ট দেওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মাথা মুণ্ডন করতে বললেন

এবং তাঁকে কাফফারাহ স্বরূপ ছাগল যবেহ করা, বা মাথাপিছু আধা ‘ছা’ হারে ছয় জন মিসকীনকে খাওয়ানো, অথবা তিন দিন ছওম পালন করার আদেশ করলেন *(বুখারী, হা/৪৫১৭; মুসলিম, হা/২৮৮৩)*।

পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে শুধুমাত্র মাথা মুণ্ডনের ক্ষেত্রে এই ফিদ্ইয়ার কথা এসেছে। তবে অবশিষ্ট চারটি নিষিদ্ধ বিষয়ও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মাথা মুণ্ডনের মত এগুলিতেও শৌখিনতা রয়েছে।

৬. স্থলের শিকারযোগ্য প্রাণী শিকার করা: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকারযোগ্য প্রাণী হত্যা করো না’ *(মায়েদাহ ৯৫)*।

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦]

‘আর তোমাদের ইহরামকারীদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক’ *(মায়েদাহ ৯৬)*।

﴿غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١]

‘কিন্তু ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল মনে করো না’ *(মায়েদাহ ১)*।

﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾ [المائدة: ٢]

‘যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে, তখন শিকার কর’ *(মায়েদাহ ২)*। উক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত মুহরিম ব্যক্তির জন্য স্থলচর শিকারকে হত্যা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এমনকি শিকারকার্যে সহযোগিতা করা এবং অন্য কাউকে শিকারের নির্দেশনা দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়। আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) কতিপয় ছাহাবীর সাথে সফরে ছিলেন; কিন্তু তাঁরা ইহরাম অবস্থায় থাকলেও তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। সফরে তাঁরা কতগুলি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) সেগুলির মধ্যে একটি গাধীকে শিকার করলেন এবং তাঁরা সেই গোশত থেকে খেয়েছিলেন। তাঁরা বলেন, ‘আমরা বললাম, ইহরাম অবস্থায় আমরা কি স্থলচর শিকারের গোশত খাব? একথা বলে আমরা অবশিষ্ট গোশত সঙ্গে করে আনলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا»

‘তোমাদের কেউ কি তাকে শিকার করতে আদেশ করেছে, অথবা এটির প্রতি ইশারা করেছে?’ তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন,

«فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»

‘তাহলে তোমরা তার অবশিষ্ট গোশত থেকে খেতে পার’ *(বুখারী, হা/১৮২৪; মুসলিম, হা/২৮৫৫)*।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্থলের শিকারযোগ্য প্রাণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর বিনিময় উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ هَدۡيَۢا بَٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ أَوۡ كَفَّٰرَةٞ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوۡ عَدۡلُ ذَٰلِكَ صِيَامٗا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمۡرِهِۦۗ﴾ [المائدة: ٩٥]

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে স্থলচর শিকারকে হত্যা করবে, তার উপর ঐ প্রাণীর সমান বিনিময় ওয়াজিব হবে, যাকে সে হত্যা করেছে; দু’জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফায়ছালা করবেন। বিনিময়ের প্রাণীটি উৎসর্গ হিসাবে কা‘বায় পৌঁছাতে হবে, অথবা কাফফারা স্বরূপ তার উপর কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো ওয়াজিব হবে, অথবা তার সমপরিমাণ ছওম

পালন করবে, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে' *(মায়েদাহ ৯৫)*। উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায়, ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকারযোগ্য স্থলচর প্রাণীকে হত্যা করলে যদি তার সমকক্ষ কোনো গৃহপালিত পশু পাওয়া যায়, তাহলে তার সামনে তিনটি পথ: হয় সে হত্যাকৃত প্রাণীর সমকক্ষ প্রাণীটিকে হারাম এলাকায় যবেহ করে তার সম্পূর্ণ গোশত ছাদাক্বা করে দিবে, তা থেকে সে নিজে মোটেও খাবে না, অন্যথায় সমকক্ষ পশুটির মূল্য খাদ্যের হিসাবে হিসাব করে মাথাপিছু আধা 'ছা' হারে মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করতে হবে, অথবা মিসকীনদের সংখ্যার সমপরিমাণ ছওম পালন করতে হবে। কিন্তু যদি হত্যাকৃত প্রাণীটির সমকক্ষ পশু না পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত বিবরণ মোতাবেক খাদ্য খাওয়াতে হবে অথবা ছওম পালন করতে হবে।

আয়াতটি আরো প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপরেই এই বিনিময় ওয়াজিব হবে; ভুলবশতঃ বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীর উপরে নয়। আমাদের শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায তাঁর 'মাজমূউ ফাতাওয়া *(১৭/২০৩)*'-তে, শায়খ মুহাম্মাদ আমীন শানক্বীত্বী 'আযওয়াউল বায়ান *(২/১৬৯)*'-এ এবং শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী সূরা মায়েদাহ্র উক্ত আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, হারাম এলাকার শিকারযোগ্য প্রাণী মুহরিম এবং সাধারণ মানুষ সবার উপরই হারাম; বরং সেটিকে তাড়ানোও হারাম। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এমনিতে উদগত গাছ-গাছালি কাটাও হারাম। মানুষের রোপনকৃত গাছ-গাছালির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বর্ণিত হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»

'আল্লাহ মক্কাকে হারাম এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটিকে আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। তবে আমার জন্য কিছুক্ষণ সেটিকে হালাল করা হয়েছিল। এখানকার তাযা ঘাস ছাটা যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, শিকারযোগ্য প্রাণীকে তাড়ানো চলবে না এবং পতিত বস্তু উঠানো যাবে না; তবে মূল মালিকের সন্ধান নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তা উঠাতে পারে' *(বুখারী, হা/১৮৩৩; মুসলিম, হা/৩৩০২)*। হাদীছে উল্লেখিত خَلَا। অর্থ হচ্ছে, তাযা ঘাস।

মদীনার হারাম এলাকার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا»

‘নিশ্চয়ই ইবরাহীম মক্কাকে হারাম এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদীনার কালো পাথরবেষ্টিত দুই এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে হারাম অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা দিলাম। এখানকার গাছ-গাছালি কাটা যাবে না এবং শিকারযোগ্য পশু শিকার করা যাবে না’ *(মুসলিম, হা/৩৩১৭)*। আলী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

«وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا»

‘মূল মালিকের সন্ধান নিতে আগ্রহী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য এখানকার পতিত বস্তু উঠানো যাবে না’ *(আবূ দাঊদ, হা/২০৩৫, সনদ ছহীহ)*।

মূল মালিকের সন্ধান নিতে আগ্রহী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য দুই হারাম এলাকায় পতিত বস্তু উঠানো নিষেধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, এই দুই জায়গায় মানুষ নিয়মিত যাতায়াত

করে। ফলে কেউ কোন জিনিস হারালে সে কয়েক বছর পরে হলেও তার হারানো জিনিস পেয়ে যাবে। আর সে কারণে মক্কা ও মদীনায় আমানতদার এমন কর্তৃপক্ষ থাকা উচিৎ, যারা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষের হারানো জিনিস গ্রহণ করবে এবং তার মূল মালিক যখনই আসুক, তা তাকে ফেরৎ দিবে।

আর আল্লাহ যেহেতু হারাম এলাকার শিকারযোগ্য প্রাণী হত্যা করা হারাম করেছেন এবং তিনি এটিকে নিরাপদ করেছেন, সেহেতু ঐসব প্রাণীর খাদ্য গাছ-গাছালি, সবুজ ঘাস নষ্ট করাও হারাম করেছেন। ফলে এই বিধানের মাধ্যমে ঐসব প্রাণী হারাম এলাকায় যেমন তাদের নিরাপত্তা পেল, তেমনি তাদের খাবার ব্যবস্থাও নিশ্চিত হল।

৭. বিবাহ সম্পন্ন করা এবং বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া: উসমান ইবনে আফফান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ»

'মুহরিম ব্যক্তি নিজে যেমন বিয়ে করবে না, তেমনি অন্যকেও বিয়ে দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও পেশ করবে না' *(মুসলিম, হা/৩৪৪৬)*। কোন মুহরিম কর্তৃক বিবাহ সংঘটিত হলে

উক্ত বিবাহ সঠিক গণ্য হবে না। সেজন্য উক্ত বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে হলে নতুনভাবে আবার বিয়ে পড়াতে হবে।

৮ ও ৯. স্ত্রী সহবাস করা এবং যৌন উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা: মহান মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

'হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধবে, তার জন্য হজ্জে স্ত্রী সহবাস করা, অশোভন কোন কাজ করা এবং ঝাগড়া-বিবাদ করা জায়েয নয়' *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। আয়াতে 'রফাছ' (رَفَثَ) শব্দটি স্ত্রী সহবাস এবং যৌন উত্তেজনার সহিত স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন উভয়কে শামিল করে। অনুরূপভাবে ইহা অশোভন কথা এবং কাজকেও শামিল করে। 'ফুসূক্ব' (فُسُوقَ) শব্দটি যাবতীয় পাপাচারকে বুঝায়। অনর্থক এবং হিংসা-বিদ্বেষ মূলক তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া বুঝাতে 'জিদাল' (جِدَالَ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে হক্ককে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে বিতর্ক করা যায়; বরং তা করা উচিৎ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]

‘তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন’ *(নাহ্‌ল ১২৫)*। অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿ ۞وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

‘তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে যুলম করেছে’ *(আনকাবূত ৪৬)* ।

মুহরিম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে বা যৌন উত্তেজনার সহিত পরস্পরে আলিঙ্গন করলে কি আবশ্যক হবে, তদ্বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে এ বিষয়ে ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) থেকে কতিপয় আছার বর্ণিত হয়েছে। আমর ইবনে শু‘আইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ‘এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর নিকটে এসে ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর দিকে ইশারা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে বললেন। শু‘আইব বলেন, লোকটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) না চেনায় আমি তার সাথে গেলাম। লোকটি ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) কে জিজ্ঞেস করলে

তিনি জবাবে বলেন, «بَطَلَ حَجُّكَ» 'তোমার হজ্জ বাতিল হয়ে গেছে'। লোকটি বললেন, এখন আমার করণীয় কি? তিনি বললেন,

«اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ وَأَهْدِ»

'লোকদের সাথে বেরিয়ে যাও এবং তাদের মত তুমিও হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন কর। তবে আল্লাহ বাঁচালে আগামী বছর আবার হজ্জ করবে এবং একটি ফিদ্‌ইয়া দিবে'। (শু'আইব বলেন) অতঃপর লোকটি আমার সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর নিকটে গিয়ে তাঁকে সবকিছু বললেন। এবার তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে বললেন। শু'আইব বলেন, আমি তার সাথে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর মত জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি আমার সাথে আবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর নিকটে এসে তাঁকে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর বক্তব্য শুনালেন এবং বললেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন,

«قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالاَ»

‘তাঁদের অভিমতের মতই আমার অভিমত’ *(হাকেম, ২/৬৫, তিনি বলেন, হাদীছটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য এবং হাফেয। শুআইব ইবনে মুহাম্মাদ যে তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন, এই হাদীছটি তারও বাস্তব এবং নিশ্চিত প্রমাণ। হাফেয যাহাবী হাকেমকে সমর্থন করেছেন)*। ইমাম বায়হাক্বী (রহেমাহুল্লাহ) হাকেমের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনার পর বলেন, ‘এর সনদ ছহীহ এবং হাদীছটি আরো প্রমাণ করে যে, শু‘আইব ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর কাছ থেকে হাদীছটি শুনেছেন’ *(সুনানে কুবরা, ২/৬৫)*। **যাহোক, উক্ত আছারে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর সর্বসম্মতিতে প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারীর হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে; তবে হজ্জের অবশিষ্ট কার্যাবলী তাকে পূর্ণ করতে হবে। আর পরবর্তী বছর তাকে আবার হজ্জ আদায় করতে হবে এবং একটি ফিদ্ইয়া দিতে হবে।** তাঁদের সবার উক্তি ‘লোকদের সাথে বেরিয়ে যাও এবং তাদের মত তুমিও হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন কর। তবে আল্লাহ বাঁচালে আগামী বছর আবার হজ্জ করবে এবং একটি ফিদ্ইয়া দিবে’ প্রমাণ করে যে,

প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বেই ঐ ব্যক্তি কর্তৃক স্ত্রী সহবাস সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে একটি উট কুরবানী করে তার গোশত হারাম এলাকার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে প্রাথমিক হালালের পরে স্ত্রী সহবাস করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হজ্জ নষ্ট হবে না এবং এক্ষেত্রে তাকে একটি ছাগল ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

আর ওমরার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, সা'ঈ অথবা ত্বওয়াফের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে ওমরা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ঐ ওমরা সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রথম ওমরার মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে নতুন আরেকটি ওমরা করতে হবে। সাথে সাথে তাকে একটি ফিদ্ইয়াও দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া হচ্ছে, ছাগল যবেহ করে তার গোশত হারাম এলাকার দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া। পক্ষান্তরে যদি সে সা'ঈর পরে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে, তাহলে তার ওমরা নষ্ট হবে না। তবে তাকে একটি ছাগল ফিদ্ইয়া দিতে হবে। অবশ্য যদি যৌন উত্তেজনার সহিত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে আলিঙ্গন করে এবং বীর্যপাত ঘটে, তাহলে তার হজ্জ নষ্ট হবে না। কেননা যেনার ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় হাদ্দ অর্থাৎ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি ওয়াজিব হয়

না। তাছাড়া যে সহবাসের মাধ্যমে হজ্জ নষ্ট হয়, এটি সে পর্যায়ের নয়। তবে প্রাথমিক হালালের পূর্বে এমনটি করে থাকলে তাকে উট ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে। আর প্রাথমিক হালালের পরে করলে ছাগল ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে।

উক্ত বিধিবিধান পুরুষের মত মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে স্ত্রীকে যদি একাজে বাধ্য করা হয়, তবে তার উপর ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হবে না।

হজ্জ ও ওমরার সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত নিয়ম

এক নযরে ওমরাঃ মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধবে। হারামে পৌঁছে ত্বওয়াফ এবং সা‘ঈ করবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাবে। ওমরার ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে হারাম এলাকার বাহির থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

এক নযরে হজ্জঃ বহিরাগত হাজীরা নিজ নিজ মীক্বাত থেকে এবং মক্কাবাসী ও সেখানে অবস্থানকারীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। ক্বিরান এবং ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ত্বওয়াফে ক্বুদূম বা আগমনী ত্বওয়াফ করবে এবং ছাফা-মারওয়া সা‘ঈ করবে। তবে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা‘ঈ করতে চাইলে তারা এই সা‘ঈ পিছিয়ে দিতে পারে। ৮ই যিল-হজ্জের দিনের বেলায় এবং ৯ই যিল-হজ্জের রাতে হাজীরা মিনায় থাকবে। অতঃপর

তারা আরাফায় অবস্থান এবং মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করতে যাবে। ঈদের দিন জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে, তার উপর কুরবানী থাকলে কুরবানী করবে, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটবে, ত্বওয়াফে ইফাদ্বা করবে এবং তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হলে ছাফা-মারওয়া সা'ঈ করবে। অনুরূপভাবে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ত্বওয়াফে ক্বুদূমের সাথে সা'ঈ না করে থাকলে তারাও এসময় সা'ঈ করবে। অতঃপর তাশরীক্বের দিনগুলিতে মিনায় রাত্রিযাপন করবে এবং প্রত্যেকদিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিন জামরাতেই কংকর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর মক্কা ত্যাগের সময় বিদায়ী সাত চক্কর ত্বওয়াফ করে মক্কা ছাড়বে।

হজ্জ ও ওমরার বিস্তারিত নিয়ম

ইহরামের প্রস্তুতি

হজ্জ ও ওমরা পালনেচ্ছু মুসলিম ব্যক্তি মদীনার মত মীক্বাতের নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে গাড়ী যোগে মক্কায় আসতে চাইলে বাড়ী থেকেই সে ইহরামের প্রস্তুতি নিতে পারে। ইহরামের প্রস্তুতি হিসাবে প্রয়োজন দেখা দিলে নখ কাটবে, গোঁফ ছাটবে, নাভীর নীচের চুল চেঁছে ফেলবে, বগলের লোম ছাফ করবে। অতঃপর ইহরামের জন্য গোসল করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং পরনের কাপড় ও গায়ের চাদর পরবে। অতঃপর মীক্বাত

থেকে ইহরাম বাঁধবে। সে যদি যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশক শুরু হওয়ার পরে ইহরাম বাঁধে এবং কুরবানী করতে চায়, তাহলে চুল, নখ কোনটিই কাটবে না। উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»

‘যখন তোমরা যুল-হিজ্জাহ মাসের চাঁদ দেখবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সে যেন তার চুল-নখ না কাটে’ *(মুসলিম, হা/৫১১৯)*। তবে যুল-হিজ্জাহ্র প্রথম দশকে সম্পাদিত ওমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্য যে চুল ছাটা হয়, তা এই হুকুমের মধ্যে পড়বে না। কেননা তা ওমরার একটি ওয়াজিব কাজ।

কেউ যদি দূর থেকে গাড়ী যোগে হজ্জ বা ওমরা করতে আসে, তাহলে সে মীক্বাতে নামবে এবং যা কিছু কাটা বা ছাটা দরকার, করবে। অতঃপর ইহরামের জন্য গোসল করে পরনের কাপড় এবং গায়ের চাদর পরবে। তারপর ইহরাম বাঁধবে। যেমন: কোনো ইয়েমেনী যদি ইয়ালামলাম অতিক্রম করে, তাহলে সে সেখানে নেমে উক্ত কাজগুলি করবে। তবে সে যদি বিমান যোগে আসে, তাহলে তার দেশ থেকেই গোসলসহ ইহরামের যাবতীয়

প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে। অতঃপর বিমান মীক্বাত বরাবর আসলে অথবা মীক্বাতের নিকটবর্তী হলে ইহরাম বাঁধবে।

ইহরাম

১. হজ্জ বা ওমরার কার্যাবলী শুরু করার **নিয়তকেই ইহরাম** বলে। অতএব, নিয়্যত ছাড়া কেউ মুহরিম হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

প্রত্যেকটি আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল' *(বুখারী, হা/১; মুসলিম, হা/৪৯২৭)*। নিয়্যতবিহীন ইহরামের কাপড় পরাকে ইহরাম বলা যায় না; বরং ইহা ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি হিসাবে গণ্য। অতএব, সে যে প্রকারের হজ্জ করতে চায়, মনে মনে তার নিয়্যত করবে। তামাত্তু হজ্জ করতে চাইলে ওমরার নিয়্যত করবে, ইফরাদ হজ্জ করতে চাইলে শুধু হজ্জের নিয়্যত করবে এবং ক্বিরান হজ্জ করতে চাইলে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়্যত করবে। হজ্জের মাসগুলিতে স্থলপথ, আকাশ পথ বা পানি পথে মীক্বাত অতিক্রম করলে অথবা মীক্বাত বরাবর স্থানে পৌঁছলে উক্ত নিয়্যত করতে

হয়। আর হজ্জের মাসগুলি হচ্ছে, শাওয়াল, যুল-ক্বা‘দাহ এবং যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশক। তবে হজ্জের মাসগুলির বাইরে অন্য মাসে কেউ যদি মীক্বাত অতিক্রম করে বা মীক্বাত বরাবর স্থানে পৌঁছে, তাহলে সে শুধুমাত্র ওমরার ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের সাথে এই ওমরার কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না।

২. মুহরিম ব্যক্তি মনে মনে যে নিয়্যত করেছে, তা মুখে উচ্চারণ করা ভাল। সে তার হজ্জের প্রকার অনুযায়ী বলবে, لَبَّيْكَ عُمْرَةً ‘লাব্বাইক উমরাতান’ (**অর্থ:** আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে ওমরার জন্য হাযির), বা لَبَّيْكَ حَجًّا ‘লাব্বাইক হাজ্জান’ (**অর্থ:** আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে হজ্জের জন্য হাযির), অথবা لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ‘লাব্বাইক উমরাতান ওয়া হাজ্জান’ (**অর্থ:** আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে ওমরা ও হজ্জের জন্য হাযির)। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিরান হজ্জ করেন এবং একসাথে হজ্জ ও ওমরার নিয়্যত করেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন,

«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»

‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাব্বাইক উমরাতান ওয়া হাজ্জান' বলতে শুনেছি’ *(মুসলিম, হা/২৯৯৫)*। অনুরূপভাবে ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান’ (**অর্থ:**

হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে ওমরার জন্য হাযির), বা 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান' অথবা 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান ওয়া হাজ্জান'ও পড়া যায়। জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জে গিয়ে বলেছিলাম, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বিল-হাজ্জ'। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হজ্জের নিয়্যতকে ওমরায় পরিণত করার আদেশ করেছিলেন, আর আমরা তা-ই করেছিলাম' *(বুখারী, হা/১৫৭০)*।

হজ্জ এবং ওমরার নিয়্যত ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতের নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। যেমন: ত্বওয়াফ, সা'ঈ, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ইত্যাদির নিয়্যত। কেননা অন্য ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণিত হয়নি। অন্যান্য ইবাদতে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা যদি কল্যাণকর হত, তবে ছাহাবায়ে কেরামসহ এই উম্মতের অন্যান্য সালাফে ছালেহীন তা করতেন।

৩. মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত জুড়ে দিতে পারে। সে বলতে পারে, فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي *(**উচ্চারণ:** ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন ফামাহিল্লী হায়ছু হাবাসতানী)*, **অর্থ:** যদি আমার হজ্জ ও ওমরা পালনে কোন বাধা আসে, তাহলে

(হে আল্লাহ!) যেখানে আপনি আমাকে বাধা দিবেন, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান গণ্য হবে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন,

«دَخَلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حُجِّى وَاشْتَرِطِى أَنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى»

‘দ্বুবা‘আহ বিনতে যুবায়ের ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে দ্বুবা‘আহ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হজ্জ করতে চাই; কিন্তু আমি অসুস্থ? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি হজ্জ করতে যাও এবং এই বলে শর্ত কর যে, (হে আল্লাহ্!) আপনি যেখানেই আমাকে বাধা দিবেন, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান গণ্য হবে’ *(বুখারী, হা/৫০৮৯; মুসলিম, হা/২৯০৩)*। এরূপ শর্তারোপ করার উপকার হচ্ছে এই যে, মুহরিম ব্যক্তি অসুস্থতা বা সড়ক দুর্ঘটনার কারণে যদি হজ্জ বা ওমরা পালন করতে ব্যর্থ হয়, অথবা তাকে হজ্জ বা ওমরা শেষ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর কিছুই বর্তাবে না।

৪. মুহরিম ব্যক্তি যদি মদীনাবাসীর মীক্বাত যুল-হুলায়ফা থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে সে ইহরাম বাঁধার আগে ফরয বা নফল ছালাত আদায় করে ইহরাম বাঁধতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্বীক্ব উপত্যকায় বলতে শুনেছি,

«أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِى حَجَّةٍ»

‘রাতে আমার নিকটে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন আগমনকারী (জিবরীল) এসে বলেন, আপনি বরকতময় এই উপত্যকায় ছালাত আদায় করুন এবং বলুন, 'উমরাতান ফী হাজ্জাহ' (অর্থাৎ একসঙ্গে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধুন)’ *(বুখারী, হা/১৫৩৪)*।

মীক্বাতে যানবাহনে আরোহণের পর ইহরাম বাঁধা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

«أَهَلَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً»

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তাঁর বাহন দাঁড়ানোর পর তিনি নিয়্যত করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়েন’ *(বুখারী, হা/১৫৫২; মুসলিম, হা/২৮২১)*। ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে, بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ ‘সওয়ারীর পিঠে আরোহনের সময় নিয়্যত বাঁধা এবং তালবিয়া পাঠের পূর্বে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং বড়ত্ব বর্ণনা করা’ অনুচ্ছেদ। এরপর তিনি এমর্মে বর্ণিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছ উল্লেখ করেন *(হা/১৫৫১)*। হাফেয ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, وَهَذَا الْحُكْمُ -وَهُوَ اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ قَبْلَ الْإِهْلَالِ- قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِذِكْرِهِ مَعَ ثُبُوْتِهِ ‘ইহরাম বাঁধার পূর্বে তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি উত্তম হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প সংখ্যক বিদ্বানই তা উল্লেখ করেছেন’।

৫. ইহরাম না বেঁধে মীক্বাত অতিক্রম করবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীক্বাত নির্ধারণ করে দেওয়ার সময় বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

‘এসব এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরা করতে চায় এবং তারা ব্যতীত যারাই এসব এলাকা দিয়ে হজ্জ ও ওমরা করতে আসবে, এগুলি তাদের সকলের মীক্বাত’। মীক্বাতের আলোচনার সময় হাদীছটি গত হয়ে গেছে।

৬. যার বাড়ী মক্কা এবং মীক্বাতের মধ্যবর্তী স্থানে, সে তার বাড়ী থেকেই ইহরাম বাঁধবে। ইহরাম না বেঁধে বাড়ী ত্যাগ করবে না। কেননা তার বাড়ীই হচ্ছে তার মীক্বাত। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মীক্বাতসমূহ নির্ধারণ করেন এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধার আদেশ দেন, তখন তিনি বলেন,

«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»

‘যারা মীক্বাতসমূহের ভেতরে বসবাস করে, তারা তাদের অবস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে; এমনকি মক্কাবাসী মক্কা থেকে’। হাদীছটি ইতোপূর্বে গত হয়ে গেছে।

৭. মক্কাবাসী এবং সেখানে অবস্থানরত অন্যান্যদের হজ্জের ইহরাম হবে মক্কা থেকেই। পক্ষান্তরে তাদের (মক্কাবাসী এবং সেখানে অবস্থানরত অন্যান্যদের) ওমরার ইহরাম হবে হারাম এলাকার বাইরে যে কোনো হালাল এলাকা থেকে। কেননা হজ্জের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়েশা

রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে ওমরার অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন তিনি হারাম এলাকার বাইরে তান'ঈম থেকে ইহরাম বেঁধেছিলেন *(বুখারী, হা/১৭৮৫; মুসলিম, হা/২৯১০)*।

ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কাবাসী কর্তৃক হারাম এলাকার বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধার কারণে তাদের ওমরায় হারাম এবং হালাল উভয় এলাকার সমন্বয় ঘটে। অনুরূপভাবে হজ্জের জন্য হারাম এলাকা থেকে ইহরাম বাঁধলেও হালাল এলাকা আরাফায় অবস্থানের কারণে তাদের হজ্জেও হারাম এবং হালাল উভয় এলাকার সমন্বয় ঘটে।

৮. তামাত্তু হজ্জের ক্ষেত্রে মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলির কোনো এক সময় মীক্বাত থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর ত্বওয়াফ এবং সা'ঈ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর যুল-হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং পর্যায়ক্রমে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করবে। তামাত্তু হজ্জ পালনকারী কুরবানী করবে। সে একটি ছাগল কুরবানী দিতে পারে অথবা সাত জনে একটি উট বা গরুতে অংশগ্রহণ করতে পারে। কেউ কুরবানী দিতে অক্ষম হলে তাকে ১০টি ছওম পালন করতে হবে; তিনটি হজ্জে এবং অবশিষ্ট ৭টি হজ্জ থেকে ফিরে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

'আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরা একত্রে পালন করতে চাও, যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে হাদঈ (হজ্জের কুরবানী) যবেহ করাই তাদের উপর কর্তব্য। কিন্তু যারা হাদঈর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলির মধ্যে তিনটি ছওম পালন করবে আর সাতটি পালন করবে হজ্জ থেকে ফিরে যাওয়ার পর। এভাবে দশটি ছওম পূর্ণ করতে হবে। এ বিধান তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ পালনকারীর উপর শুকরিয়াস্বরূপ এই হাদঈ যবেহ করা ওয়াজিব হয়; ক্ষতিপূরণ হিসাবে নয়। অর্থাৎ এক সফরে হজ্জ ও ওমরা দু'টি ইবাদত সম্পন্ন করার কারণে সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়াস্বরূপ হাদঈ প্রদান করবে; হজ্জে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যাওয়ার কারণে নয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরা একত্রে পালন করতে চাও, যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তাদের উপর কর্তব্য'-এর তাফসীরে হাফেয ইবনে কাছীর (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্জ করবে। আর তামাত্তু হজ্জ দুইভাবে হতে পারে: একই সাথে হজ্জ

ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধবে[12]। অথবা প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরা সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। শেষোক্তটিই খাছ এবং প্রসিদ্ধ তামাত্তু হজ্জ। তবে সাধারণ অর্থে তামাত্তু বলতে উল্লেখিত দুই প্রকার হজ্জকেই বুঝায়; ছহীহ হাদীছসমূহ একথার প্রমাণ বহন করে। কেননা কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু হজ্জ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ক্বিরান হজ্জ করেছেন। যদিও তিনি যে কুরবানী সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে কোনো মতানৈক্য নেই'[13]।

ক্বিরান হজ্জের ক্ষেত্রে মুহরিম ব্যক্তি মীক্বাত থেকে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে ত্বওয়াফে

---

[12] যা কিরান নামে প্রসিদ্ধ। [সম্পাদক]

[13] তাই বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে তিনি কিরান হজ্জ করেছেন। তবে যেহেতু হজ্জের মাসে উমরা আদায় করার সুবিধা নিয়েছিলেন, সেটা একপ্রকার তামাত্তু বা উপকার অর্জন। সে হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম কিরানকেও মর্মার্থের দিকে খেয়াল করে তামাত্তু বলতেন। আর হাদঈ এর ব্যাপারে উভয় প্রকার হজ্জের বিধানই এক। তামাত্তু ও কিরান উভয় প্রকার হজ্জের ক্ষেত্রেই তাকে 'দমে শোকর' দিতে হবে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে কিরানকারীও তামাত্তু বা উপকার অর্জন করল। সে হিসেবেই কুরআনের আয়াতে 'তামাত্তা'আ' শব্দটি এসেছে। আর সে হিসেবেই কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরান হজ্জকেও তামাত্তু নাম দিয়েছিলেন। [সম্পাদক]

ক্বুদূম বা আগমনী ত্বওয়াফ শেষে ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করতঃ কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। কুরবানীর দিন জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ শেষে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেটে হালাল হয়ে যাবে। তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর মত ক্বিরান হজ্জ পালনকারীকেও কুরবানী করতে হবে।

ইফরাদ হজ্জের ক্ষেত্রে মুহরিম ব্যক্তি মীক্বাত থেকে শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং ক্বিরান হজ্জ পালনকারীর মত একই কাজ করবে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ক্বিরান হজ্জ পালনকারীকে কুরবানী করতে হয়; কিন্তু ইফরাদ হজ্জ পালনকারীকে কুরবানী দিতে হয় না।

৯. তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে তামাত্তু হজ্জ সর্বোত্তম। যেসব ছাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওমরার ইহরাম বাঁধেন, কেউ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন, আবার কেউ কেউ হজ্জ-ওমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধেন। তাঁরা মক্কায় পৌঁছলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্বিরান অথবা ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ছিলেন এবং সঙ্গে হাদঈ নিয়ে যান নি, তাঁদের প্রত্যেকের ইহরামকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার ইহরামে পরিণত করার আদেশ করেন। কারণ এর মাধ্যমে তাঁরা তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হয়ে

যেতে পারবেন। আর এটি সর্বোত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাঁদেরকে পথনির্দেশ করতেন না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ক্বিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন এবং সঙ্গে হাদঈ নিয়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁর আগের ইহরামের উপরেই অব্যাহত থেকে গিয়েছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন,

«لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ»

'আমি আগে যে কাজটি করেছি তা যদি এখন করতে পারতাম, তাহলে হাদঈ সঙ্গে আনতাম না। আর আমার সাথে যদি হাদঈ না থাকত, তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম' *(বুখারী, হা/১৬৫১; মুসলিম, হা/২৯৪৩, জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত)*।

১০. কোনো কোনো বিদ্বান তামাত্তু হজ্জকে ওয়াজিব বলেছেন। তবে অধিকাংশই এটিকে ওয়াজিব বলেন নি। কেননা আবূ বকর, ওমর এবং উছমান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) ইফরাদ হজ্জ করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত বক্তব্য থেকে তাঁরা যদি তামাত্তু হজ্জ ওয়াজিব বুঝতেন,

তাহলে তাঁরা অন্য হজ্জ করতেন না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈসা (‘আলাইহিস্সালাম) শেষ যামানায় আসমান থেকে অবতরণের পর তিনি তিন প্রকার হজ্জের যে কোন একটির ইহরাম বাঁধবেন *(মুসলিম, হা/৩০৩০)*। হাদীছটি এরূপ:

«وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا»

‘যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্ত্বার কসম! অবশ্যই মারইয়াম তনয় (ঈসা) ফাজ্জুর রওহা (মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী একটি) স্থানে হজ্জ অথবা ওমরা অথবা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করবেন’। উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে যে, ক্বিরান এবং ইফরাদ হজ্জের বিধান অবশিষ্ট রয়েছে।

১১. ক্বিরান এবং ইফরাদ হজ্জ পালনকারী যদি সঙ্গে করে হাদঈ নিয়ে যায়, তাহলে কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর হজ্জে তা-ই করেছিলেন। পক্ষান্তরে তারা যদি হাদঈর পশু সঙ্গে না নিয়ে যায়, তাহলে তাদের ইহরামকে ওমরার ইহরামে রূপান্তর করবে। ইতোপূর্বে আমরা এমর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ উল্লেখ করেছি। ওমরা পালনকারী যদি হজ্জের মাসের

বাইরে অথবা হজ্জের মাসে হাদঈর পশু সঙ্গে নিয়ে যায়, কিন্তু তার হজ্জের নিয়্যত না থাকে, তাহলে ওমরা শেষে সে সেটাকে যবেহ করে ফেলবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিইয়ার ওমরাতে হাদঈর পশু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু মুশরিকরা তাঁকে তাঁর ওমরা সম্পন্ন করতে বাধা দিয়েছিল। ফলে তিনি হুদায়বিইয়াতে সেটিকে যবেহ করেছিলেন। আর যদি কেউ তামাত্তু হজ্জ তথা হজ্জ ও ওমরা উভয়ের ইহরাম বাঁধে এবং সঙ্গে করে হাদঈর পশু হাঁকিয়ে বা বহন করে নিয়ে যায়, তাহলে সে ক্বিরান হজ্জ পালনকারী হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত হাদীছটি একথার প্রমাণ বহন করে *(বুখারী, হা/১৫৫৬ ও ৪৩৯৫; মুসলিম, হা/২৯১০)*।

১২. যদি কোনো পুরুষ বা মহিলার সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান থাকে, তাহলে তারা তাকে হজ্জ এবং ওমরা করাতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হলে সে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ইহরাম বাঁধবে। আর ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম না হলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধবে। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ইহরাম বাঁধা তার অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়। অতএব, অভিভাবক যদি অপ্রাপ্ত

বয়ষ্ক সন্তানের ইহরামের ব্যবস্থা না করে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না।

উল্লেখ্য যে, অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক বাচ্চা কর্তৃক হজ্জ ও ওমরা সম্পাদিত হলেও তা নফল হিসাবে গণ্য হবে। সেজন্য প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়ার পরে তার উপর হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব হবে। হজ্জ ও ওমরার শর্তসমূহ উল্লেখ করার সময় এ বিষয়ে আমরা দলীল পেশ করেছি। বাচ্চা কংকর নিক্ষেপে সক্ষম না হলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করে দিবে। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, বাচ্চা কংকর নিক্ষেপে সক্ষম না হলে তার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করে দেওয়া যাবে' *(আল-ইজমা/৬৬)*। প্রাপ্ত বয়ষ্করা হজ্জের যেসব কাজ করে, বাচ্চাদেরকেও সেগুলো করতে হবে। অনুরূপভাবে প্রাপ্ত বয়ষ্করা যেসব নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, বাচ্চাদেরকেও সেগুলি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়ষ্ক বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তার অভিভাবক ত্বওয়াফ বা সা'ঈ করলে অভিভাবক নিজের পক্ষ থেকে যেমন ত্বওয়াফ বা সা'ঈর নিয়্যত করবে, তেমনি ঐ বাচ্চার পক্ষ থেকেও ত্বওয়াফ বা সা'ঈর নিয়্যত করবে।

বাচ্চাদেরকে নিয়ে তাদের অভিভাবকদের পৃথক ত্বওয়াফের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা যে মহিলাটি তার

বাচ্চার হজ্জ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁকে তিনি এমনটি নির্দেশ করেন নি। মহিলাটি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এর কি হজ্জ হবে? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ! আর তুমি নেকী পাবে’ *(মুসলিম, হা/৩২৫৪)*।

১৩. হজ্জ বা ওমরা পালনেচ্ছু ঋতুবতী অথবা প্রসূতি মহিলা মীক্বাত অতিক্রম করলে তারাও ইহরাম বাঁধবে এবং ত্বওয়াফ ব্যতীত সাধারণ হাজীরা যা করে, তারাও তাই করবে। পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে ত্বওয়াফ করে নিবে। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, ‘আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হয়ে যখন যুল-হুলায়ফাতে পৌঁছলাম, তখন আসমা বিনতে উমাইস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকরকে প্রসব করলেন। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানতে চেয়ে খবর পাঠালেন যে, আমি এখন কি করব? তিনি বললেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»

তুমি গোসল করে নাও এবং একটি নেকড়া বেঁধে ইহরাম বাঁধ’ *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বিদায় হজ্জে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ওমরার

ইহরাম বাঁধলেন। কিন্তু তিনি ঋতুবতী হয়ে গেলেন। লোকজন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরও তিনি ঋতুস্রাব মুক্ত হলেন না। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঐ ওমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে বললেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ক্বিরান হজ্জ পালনকারিণীতে পরিণত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন,

«إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

'একজন সাধারণ হাজী যা করে, তুমিও তাই কর। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করো না' *(বুখারী, হা/৩০৫; মুসলিম, হা/২৯১৯)*।

১৪. ঋতুগ্রস্ত হওয়ার কারণে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হজ্জ থেকে পৃথক একটি ওমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হন নি বলে তিনি হজ্জের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি ওমরা করার আবেদন করেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা)-এর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) কে তাঁর বোনকে সঙ্গে করে মক্কার নিকটতম হালাল এলাকা তান'ঈম-এ নিয়ে যেতে বলেন এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) সেখান থেকেই ওমরার ইহরাম বাঁধেন *(বুখারী, হা/১৭৮৫;*

মুসলিম, হা/২৯১০)। অতএব, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর মত যার অবস্থা হবে, সে হজ্জের পরে তাঁর মত ওমরা করতে পারে। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু হাজী হালাল এলাকা থেকে ইহরাম বেঁধে একাধিক ওমরা করে থাকে। এটি একটি অনুচিৎ কাজ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে ওমরার অনুমতি দিয়ে তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ যখন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর ওমরা সমাপ্তির অপেক্ষায় ছিলেন, তখন তিনি আর কাউকে এমন ওমরা পালন করতে বলেন নি। তাছাড়া এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রচণ্ড ভীড়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি ত্বওয়াফ এবং সা‘ঈকারীদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবগুলি ওমরাই ছিল মক্কায় প্রবেশের সময়ে; মক্কায় অবস্থানরত অবস্থায় সেখান থেকে বাইরে গিয়ে একটি ওমরাও তিনি সম্পন্ন করেন নি।

১৫. ইহরাম অবস্থায় পোষাক হবে একটি পরনের কাপড় এবং একটি গায়ের চাদর। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ»

‘তোমাদের যে কেউ একটি পরনের কাপড়, গায়ের চাদর এবং সান্ডেল পায়ে ইহরাম বাঁধবে’ *(আহমাদ, হা/৪৮৯৯, আব্দুল্লাহ*

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হাদীছটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে ছহীহ)। কাপড় দু'টি সাদা এবং পরিষ্কার হওয়া উত্তম। ইহরামের কাপড় ময়লা হলে মুহরিম ব্যক্তি তা ধুতে পারে। অনুরূপভাবে প্রয়োজনে বদল করে ঐ জাতীয় অন্য কাপড়ও পরতে পারে। ইহরাম অবস্থায় মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় যূ-তুওয়া এলাকার কূপ থেকে গোসল করেছিলেন *(বুখারী, হা/১৫৫৩, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত)*। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, হা/১৮৪০; মুসলিম, হা/২৮৮৯)*।

১৬. মুহরিম ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক পোষাক রেখে একটি পরনের কাপড় এবং একটি গায়ের চাদর পরতে হয়। এক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইহরামের ক্ষেত্রে পোষাকের এই সমতা হাজীদেরকে মৃত্যুর পরে কাফন পরিধানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন মুসলিম যখন মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তখন সে সৎআমলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

১৭. হজ্জের মাসসমূহে কেউ ওমরা করে তার দেশে বা অবস্থান স্থলে ফিরে গেলে তার সফর শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী গণ্য হবে না।

হজ্জের মাসসমূহে কেউ ওমরা করে মদীনায় গেলে তার হজ্জের সফর শেষ না হওয়ার কারণে সে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী গণ্য হবে। অতএব, আবার মীকাত অতিক্রমের সময় সে হজ্জ বা আরেকটি ওমরার ইহরাম বাঁধবে। তবে ওমরার ইহরাম বাঁধাই উত্তম। কেননা এর মাধ্যমে সে মীকাত থেকে দু'টি ওমরা এবং একটি হজ্জ পালনে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে তামাত্তু হজ্জের জন্য নির্ধারিত একটি হাদঈ দিলেই চলবে।

১৮. যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ফরয হজ্জ আদায় করেছে অথবা ওমরা পালন করেছে, সে নিজ আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যদের পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা আদায় করতে পারে। তবে যাদের পক্ষ থেকে হজ্জ বা ওমরা করা জায়েয, কেবলমাত্র তাদের পক্ষ থেকেই সেটি করা যাবে। ফরয এবং নফল উভয় হজ্জই এই বিধানের আওতাভুক্ত হবে। কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহ করে তার পক্ষ থেকে এই হজ্জ বা ওমরা আদায় করতে পারে অথবা অর্থের বিনিময়েও আদায় করতে পারে। অর্থ-কড়ি কিছু নিলেও যেন সেটিই হজ্জ পালনের মূল উদ্দেশ্য না হয়। এমনটি নিন্দনীয়।

কেননা সে তার আমলের মাধ্যমে দুনিয়া পেতে চেয়েছে। **নেওয়ার জন্য হজ্জ করা এবং হজ্জ করার জন্য নেওয়া** এক নয়; আমাদেরকে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। কেননা নেওয়ার জন্য হজ্জ করা নিন্দনীয়। কারণ এক্ষেত্রে হজ্জ হচ্ছে **মাধ্যম** আর নেওয়া হচ্ছে **মূল লক্ষ্য**। পক্ষান্তরে হজ্জের জন্য নেওয়া প্রশংসনীয়। কারণ এক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে **মাধ্যম** এবং হজ্জ হচ্ছে **মূল লক্ষ্য**। যেমন: কেউ হজ্জ করতে চায়, কিন্তু তার হজ্জ করার মত সম্বল নেই। ফলে সে কারো কাছ থেকে গৃহীত অর্থ দিয়ে হজ্জে যেতে চায়।

কেউ কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করলে মনে মনে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিয়্যত করবে, যার পক্ষ থেকে সে হজ্জ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। সে তার নিয়্যতটা মুখেও উচ্চারণ করতে পারে। যেমন: বলতে পারে, لَبَّيْكَ حَجًّا عَنْ أَبِيْ أَوْ أُمِّيْ أَوْ عَنْ فُلَانٍ ***(উচ্চারণ:*** *লাব্বাইকা হাজ্জান আন আবী আও উম্মী আও আন ফুলান),* 'আমার পিতা, মাতা বা অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জের জন্য আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি'। যার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে, তার নাম বলবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি শুবরুমার পক্ষ থেকে নিয়্যত করছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ

করেছ? তিনি বললেন, না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

“তুমি আগে তোমার নিজের হজ্জ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো” *(ত্ববারানী, আল-মু‘জামুছ্ ছগীর, পৃ: ২২৬, আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ রক্কী ব্যতীত হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (ثقات)। আব্দুর রহমান সম্পর্কে ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) ‘তাক্বরীবুত তাহযীব’ গ্রন্থে বলেন, তিনি বিশ্বস্ত (صدوق)। অতএব, হাদীছটির সনদ ‘হাসান’। শায়খ আলবানী (রহেমাহুল্লাহ) হাদীছটির আরো কয়েকটি সূত্র (طرق) উল্লেখ করেছেন, যেগুলির মাধ্যমে এটি ‘ছহীহ লিগায়রিহী’ হবে। তিনি নিজেও এটিকে ‘ছহীহ’ বলেছেন এবং বায়হাক্বী, ইবনুল মুলাক্কিন ও ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে ছহীহ হওয়ার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন)*। হাদীছটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করে নি, সে অন্যের হজ্জ করতে পারবে না।

কোনো মহিলা কোন পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারে। ফায্ল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর হাদীছে খাছ‘আম গোত্রের এক মহিলা কর্তৃক তাঁর পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ও মুসলিম,*

হাদীছটি হজ্জ ও ওমরার শর্তসমূহ আলোচনার সময় গত হয়ে গেছে)।

অনুরূপভাবে কোনো পুরুষ কোনো মহিলার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললেন, আমার বোন হজ্জ করার মানত করেছিল, কিন্তু সে মারা গেছে? নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ»

'সে যদি ঋণী হত, তাহলে কি তুমি তার ঋণ শোধ করে দিতে?' লোকটি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন,

«فَاقْضِ اللَّهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»

'তাহলে তুমি আল্লাহ্র ঋণ পরিশোধ করে দাও। কেননা তিনি ঋণ পরিশোধের অধিকতর হক্বদার' *(বুখারী, হা/৬৬৯৯)*।

তিন শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে হজ্জ এবং ওমরা করা যায়: মৃত ব্যক্তি, অতিশয় বৃদ্ধ, যিনি ভ্রমণে সক্ষম নন এবং এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যার অসুখ ভাল হওয়ার আশা করা যায় না। যে ব্যক্তি তার বোনের হজ্জ করেছিলেন, সে ব্যক্তির হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়। খাছ'আমা গোত্রের

মহিলা কর্তৃক তাঁর পিতার হজ্জ সম্বলিত হাদীছটি প্রমাণ করে যে, অতিশয় বৃদ্ধের পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়। সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না এমন রোগীর ক্ষেত্রেও শেষের বিধানটি বলবৎ থাকবে।

তালবিয়া

১. 'তালবিয়া' শব্দটি 'লাব্বা' (لَبَّى)-এর ক্রিয়ামূল। আর 'লাব্বা' অর্থ হচ্ছে, মুহরিম ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরাতে 'লাব্বাইক' বলল। ইতোপূর্বে আমরা বলেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় বলেছিলেন, 'লাব্বাইক উমরাতান ওয়া হাজ্জাতান'। 'লাব্বাইক' (لَبَّيْكَ) শব্দটি কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সুন্দর একটি শব্দ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় ছাহাবীকে ডেকেছেন এবং তাঁরা 'লাব্বাইক' বলে সাড়া দিয়েছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডাকে তাঁদের কেউ কেউ বলতেন, 'লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! (لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ), আবার কেউ কেউ বলতেন, 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক' (لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ)। ছহীহ বুখারীতে এমন বেশ কয়েকটি হাদীছ পাওয়া যায় *(দেখুন: হা/১২৮, ৪৫৭, ৫৩৭৫ এবং ৬২৬৮)*। ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর 'সুনান'-এর 'শিষ্টাচার' অধ্যায়ে *(হা/১৬৭)* অনুচ্ছেদ রচনা

করেছেন এভাবে, ‘কাউকে ডাকা হলে সে বলবে, লাব্বাইক’। ইমাম বুখারী তাঁর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে *(৪২৭)* অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে, ‘যে ব্যক্তি ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় লাব্বাইক বলবে’।

আর স্বয়ং মহান আল্লাহ মানুষদেরকে হজ্জ করতে ডেকেছেন। তিনি তাঁর নবী ইবরাহীম ‘আলাইহিস্‌সালামকে বলেন,

﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧﴾ [الحج: ٢٧]

‘আর মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্য ঘোষণা দিয়ে দাও। তারা দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার হালকা-পাতলা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তোমার কাছে আসবে’ *(হজ্জ ২৭)*। অতএব, কোন মুসলিম যখন মীক্বাতে এসে ইহরাম বেঁধে ফেলবে, তখন তালবিয়া পড়বে। **যার অর্থ হচ্ছে, হে প্রতিপালক! আপনি আপনার পবিত্র গৃহে হজ্জ করার জন্য আমাকে ডেকেছেন এবং আমার জন্য তা সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। অতএব, হে আল্লাহ! আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি।** ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ অর্থ হচ্ছে, ‘সাড়া প্রদান করার পর সাড়া দেওয়া’।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তালবিয়া পড়তেন:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»

***(উচ্চারণ:** লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি‘মাতা লাকা ওয়াল-মুলক, লা শারীকা লাক),* অর্থাৎ ‘আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা, নে‘মত এবং সাম্রাজ্য আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই’ *(বুখারী, হা/১৫৪৯; মুসলিম, হা/২৮১১, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত)*। বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় তালবিয়ার পরে এসেছে, ‘তিনি এই চারটি বাক্যের বেশী বাড়াতেন না’ *(বুখারী, হা/৫৯১৫; মুসলিম, হা/২৮১৪)*। ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত হাদীছেও এরূপ তালবিয়ার কথা এসেছে *(হা/২৯৫০)*। ছহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতেও এরূপ তালবিয়া এসেছে, তবে সেখানে শেষোক্ত لَا شَرِيكَ لَكَ কথাটি নেই *(হা/১৫৫০)*। সুনানে নাসা‘ঈতে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষ ছহীহ সনদে আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া ছিল, লাব্বাইক ইলাহাল হাক্ক (لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ)' *(হা/২৭৫২)*।

ছহীহ মুসলিমে হাদীছের শেষাংশে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা তালবিয়াতে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করে এভাবে বলতেন,

«لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»

(হা/২৮১২)। ছহীহ মুসলিমে *(হা/২৮১৪)* হাদীছের শেষাংশে আরো এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলতেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত চারটি বাক্যে তালবিয়া পড়তেন, তিনি বলতেন,

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়ায় তাওহীদের বাণী বিঘোষিত হয়েছে এবং শির্কের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-এর দাবীও তাই। এখানে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ অর্থ (إِلاَّ اللهُ) বা 'আল্লাহ ব্যতীত'। আর لَا شَرِيكَ لَكَ অর্থ (لاَ إِلَهَ) বা 'কোনো মা'বূদ নেই'।

অন্যান্য ইবাদতের মত হজ্জও একটি ইবাদত। সুতরাং কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পদ্ধতিতেই তা আদায় করতে হবে। কেননা ইবাদাত কবুল হওয়ার দু’টি শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ। তালবিয়ায় আল্লাহ্‌র বড়ত্ব এবং প্রশংসা রয়েছে। তিনিই রাজাধিরাজ, অনুগ্রহ পরায়ণ এবং যাবতীয় প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে মুশরিকদের তালবিয়ায় শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। তারা ত্বওয়াফরত অবস্থায় বলত, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ‘আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, আপনার কোন শরীক নেই’। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ ‘এখানেই ক্ষান্ত কর, আর সামনে বেড়ো না’। অতঃপর তারা বলত, إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ‘তবে ঐ শরীক ব্যতীত, যা আপনার জন্য রয়েছে, আপনি যার মালিক আর যা কিছুর সে মালিক’ *(মুসলিম, হা/২৮১৫)*। وَيْلَكُمْ قَدْ قَد -এর অর্থ হচ্ছে, তাওহীদের কালেমা পর্যন্ত বলেই থেমে যাও, এর সাথে শির্কের সংযোজন ঘটাইও না।

৪. পুরুষদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া উত্তম। সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»

'জিবরীল ('আলাইহিস্সালাম) এসে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সঙ্গীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়ার আদেশ করুন' *(নাসা'ঈ, হা/২৭৫৩, সনদ ছহীহ)*।

তবে মহিলারা নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে। ইমাম তিরমিযী ৯২৭ নং হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেন, 'মহিলাদের উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া মাকরূহ'।

৫. হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে এবং হজ্জ পালনকারী ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তালবিয়া বন্ধ করবে। ফাযল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বর্ণিত হাদীছ এর দলীল *(বুখারী, হা/১৬৮৫)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) বলেন *(ফাতহুল বারী, ৩/৫৩৩),* জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পড়তে থাকতেন। তিনি বলেন, 'জামরাতুল আক্বাবায় প্রথম কংকরটি নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করবে নাকি সবগুলি কংকর নিক্ষেপের পর বন্ধ করবে, তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ বিদ্বানই প্রথম মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। অবশ্য আহমাদ এবং শাফে'ঈ মাযহাবের কেউ

কেউ দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করেছেন। শেষের মতাবলম্বীদের দলীল হচ্ছে, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) ফাযল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ»

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরাফা থেকে এসেছিলাম। তিনি জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তেই ছিলেন, প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর দিচ্ছিলেন। অতঃপর শেষ কংকরটি নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দিলেন' *(ছহীহ ইবনে খোযায়মা, হা/২৮৮৭)*। হাদীছটি বর্ণনার পর ইবনে খোযায়মা (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'হাদীছটি ছহীহ এবং অন্যান্য অস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যা স্বরূপ। এখানে 'জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পড়লেন'-এর অর্থ হচ্ছে, কংকর নিক্ষেপ শেষ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়লেন'। তিনি আরো বলেন, 'এই হাদীছটি স্পষ্ট বর্ণনা করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ কংকরটি নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন; প্রথম কংকর নিক্ষেপের সময় নয়'। উল্লেখ্য যে, ইবনে খুযাইমার সনদের **ওমর** নামক একজন রাবীকে ভুলক্রমে

মুহাম্মাদ বলা হয়েছে। কিন্তু ইমাম বায়হাক্বী (রহেমাহুল্লাহ) হাদীছটি বলার সময় রাবীর সঠিক নামটি উল্লেখ করেছেন *(সুনানে বায়হাক্বী, ৫/১৩৭)*।

আর ওমরা পালনকারী ত্বওয়াফ শুরু করার সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বর্ণিত হাদীছে এর প্রমাণ মিলে *(সুনানে বায়হাক্বী, ৫/১০৪)*। ইমাম তিরমিযী *(হা/৯১৯)* হাদীছটি বর্ণনার পর বলেন, এটিই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত। এরপর তিনি সুফইয়ান, শাফে'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখের নাম উল্লেখ করেন। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত তিরমিযীর এই হাদীছটির সনদ যঈফ।

মসজিদে হারামে প্রবেশ

১. মসজিদে হারামের দু'টি পরিভাষা রয়েছেঃ **এক.** কা'বা সম্বলিত পুরো মসজিদ এবং **দুই.** পুরো মক্কা। নিম্নোক্ত আয়াতটি দ্বিতীয় পরিভাষাটির প্রমাণ বহন করে: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ﴾ [التوبة: ٢٨]

‘হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না আসে[14]’ *(তওবাহ ২৮)*।

২. মসজিদে হারামসহ যে কোনো মসজিদে প্রবেশের সময় আগে ডান পা রাখবে *(মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/২১৮, তিনি মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং হাফেয যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন)*। অতঃপর বলবে,

«بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَعُوْذُ باللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

‘আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ এবং সালাম বর্ষণ করুন। আমি মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মানিত চেহারা ও সত্ত্বা এবং অনাদি শক্তির অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারসমূহ খুলে দিন’। এই দো‘আটি কয়েকটি হাদীছ গ্রন্থ থেকে চয়ন করে একত্রিত করা হয়েছে *(দ্রষ্টব্য: ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৫২; সুনানে আবূ দাঊদ, হা/৪৬৬; জামে তিরমিযী,*

---

[14] এখানে মাসজিদুল হারাম বলতে মক্কার সমগ্র হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক]

হা/৩১৪; ইবনুস সুন্নী প্রণীত 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লায়লাহ', পৃ: ৮৯ এবং ইসমাঈল ক্বাযী প্রণীত 'ফাযলুছ-ছালাতি আলান্-নাবী', পৃ: ৮২)।

৩. হজ্জ ও ওমরা পালনকারী মসজিদে হারামের যে দিক দিয়ে প্রবেশ করতে সহজ হয়, সে দিক দিয়ে প্রবেশ করবে। মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে সে স্বচক্ষে কা'বা দেখবে, নমুনা নয়, সে সরাসরি মানুষদেরকে বায়তুল্লাহ্র ত্বওয়াফ করতে এবং ছালাত আদায় করতে দেখবে। সে স্মরণ করবে, এই কা'বাকে ঘিরেই পৃথিবীর সবপ্রান্ত থেকে মুসলিমরা ছালাত আদায় করে, প্রার্থনা করে। এটি সকলের মিলনস্থল। সবাই গোলাকার বৃত্তের মত কা'বামুখী হয়ে ছালাত আদায় করে; কা'বার সবচেয়ে নিকটবর্তী গোলাকার বৃত্তটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ছোট বৃত্ত এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বৃত্তটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় বৃত্ত।

৪. ত্বওয়াফ করার ইচ্ছা নিয়ে কেউ মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে ত্বওয়াফই তার জন্য 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর ত্বওয়াফ শেষে সে মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে। পক্ষান্তরে ছালাত আদায় বা কুরআন তেলাওয়াত অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে তাকে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ'

হিসাবে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

‘তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত যেন সে না বসে’ *(বুখারী, হা/১১৬৩; মুসলিম, হা/১৬৫৪, আবূ কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত)*।

ত্বওয়াফ

১. ত্বওয়াফ আল্লাহ নির্ধারিত একটি ইবাদত এবং এটি কা‘বার বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। অতএব, কা‘বা ব্যতীত কোনো ক্ববর বা অন্য কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে ত্বওয়াফ করা যাবে না। কা‘বা ব্যতীত অন্য কোথাও যদি ত্বওয়াফের কথা শোনা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, শরী‘আতে সেটির কোন স্থান নেই; বরং তা আল্লাহ্‌র দ্বীনে নতুন আবিষ্কার। সেজন্য আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর সব জায়গায় কত মুছল্লী বা দানশীল বা ছিয়াম পালনকারী বা আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারীইনা রয়েছে। কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে, পৃথিবীর সব জায়গায় কত ত্বওয়াফকারীইনা

রয়েছে। কেননা কা‘বা কেন্দ্রিক ত্বওয়াফ ব্যতীত শরী‘আতে আর কোথাও ত্বওয়াফের কোনো অস্তিত্ব নেই।

২. বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ কখনও রুকন হিসাবে গণ্য হয়। যেমন: হজ্জের ক্ষেত্রে ‘ত্বওয়াফে ইফাদ্বা’, ওমরার ক্ষেত্রে ওমরার ত্বওয়াফ। আবার কখনও ওয়াজিব হিসাবে গণ্য হয়। যেমন: বিদায়ী ত্বওয়াফ। অনুরূপভাবে ত্বওয়াফ কখনও নফল হিসাবে গণ্য হয়। যেমন: উপরোক্ত ত্বওয়াফগুলি ব্যতীত অন্যান্য ত্বওয়াফ। উক্ত বক্তব্যের প্রমাণাদি ইতোপূর্বে ‘হজ্জ ও ওমরার রুকনসমূহ’ এবং ‘হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিবসমূহ’ আলোচনার সময় গত হয়ে গেছে।

ত্বওয়াফের ফযিলত বর্ণনায় যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার নিম্নোক্ত হাদীছটি অন্যতম,

«مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»

‘যে ব্যক্তি সাতবার এই ঘরের এমনভাবে ত্বওয়াফ করবে যে এতে গণনায় ভুল কিংবা কম-বেশি করবে না, তার একটি দাসমুক্তির নেকী হবে’ *(তিরমিযী, হা/৯৫৯, তিনি বলেন, হাদীছটি ‘হাসান’; হাদীছটি ইমাম বাগাভীও বর্ণনা করেন এবং তিনিও এটিকে ‘হাসান’ বলেন (শারহুস সুন্নাহ, হা/১৯১৬)*।

ত্বওয়াফকারী ত্বওয়াফের সময় ‘হাজারে আসওয়াদ’ এবং ‘রুকনে ইয়ামানী’ স্পর্শ করবে। এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আব্দির রহমান! আপনাকে বায়তুল্লাহ্‌র এই দুই কোণ ছাড়া অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখি না যে? তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ»

‘এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে তা গোনাহ ঝরিয়ে দেয়’। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি,

«مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»

‘যে ব্যক্তি সাতটি ত্বওয়াফ করল, সে যেন একটি দাস মুক্ত করল’ *(নাসা‘ঈ, হা/২৯১৯, সনদ হাসান)*।

৩. বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ হবে সাতটি চক্করের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি চক্কর হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু হয়ে সেখানেই আবার শেষ হবে। উল্লেখ্য যে, কা‘বার দরজার পাশের কোণটিতে হাজারে আসওয়াদ রয়েছে। ত্বওয়াফকারী পবিত্র হয়ে কা‘বাকে বাম পাশে রেখে ত্বওয়াফ করবে। ত্বওয়াফের সময় ‘হিজ্‌র’[15]

---

[15] আমাদের দেশে যেটা হাতীম নামে বিখ্যাত। [সম্পাদক]

নামক স্থানটির বাহির দিয়ে ত্বওয়াফ করবে; ভেতর দিয়ে নয়। কেননা এই স্থানটিও কা'বার অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে, হিজ্‌রের ভেতর দিয়ে ত্বওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। কেননা সে পুরো বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করে নি। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজ্‌রের বাহির দিয়েই ত্বওয়াফ করতেন। মসজিদে হারামের ভেতরের যে কোন জায়গা দিয়ে ত্বওয়াফ করলে হয়ে যাবে, তবে মসজিদের বাহির দিয়ে করলে হবে না। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত যে, মসজিদের বাহির দিয়ে ত্বওয়াফ করলে হবে না' *(আল-ইজমা/৬২)*।

৪. ত্বওয়াফকারী যখন হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছবে, তখন সহজ হলে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করবে। সম্ভব না হলে হাত অথবা অন্য কোন কিছু দিয়ে তা স্পর্শ করবে এবং যা দিয়ে স্পর্শ করেছে, তা চুম্বন করবে। সেটিও সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইশারা করবে। পাথরটি চুম্বন করার দলীল নিম্নরূপ: ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে বলেন,

«إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

‘নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি যেমন কোন ক্ষতি করতে পারো না, তেমনি কোন উপকারও করতে পারো না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না’ *(বুখারী, হা/১৫৯৭; মুসলিম, হা/৩০৭০)*। যুবায়ের ইবনে আরাবী বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) কে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»

‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথরটি স্পর্শ করতে এবং চুমু দিতে দেখেছি’ *(বুখারী, হা/১৬১১)*। কোন কিছু দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করে তা চুম্বন করার দলীল নিম্নরূপ: নাফে‘ বলেন,

«رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ»

‘আমি ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) কে হাত দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করতে, অতঃপর হাতে চুমু খেতে দেখেছি। হাতে চুমু খেয়ে তিনি বলেন, যখন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি, তখন থেকে

আমি আর তা পরিত্যাগ করি নি’ *(মুসলিম, হা/৩০৬৫)*। আবুত্ ত্বুফাইল (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ»

‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফরত অবস্থায় একটি মাথাবাঁকা লাঠি দিয়ে রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করতে এবং লাঠিটিকে চুমু দিতে দেখেছি’ *(মুসলিম, হা/৩০৭৭)*। হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করার দলীল নিম্নরূপ: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

«طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করেন। তিনি যখনই রুকন (হাজারে আসওয়াদ)-এর নিকটে আসছিলেন, তখনই সেটার দিকে ইশারা করছিলেন’ *(বুখারী, হা/১৬১২)*। উটের পিঠে আরোহণ করে ত্বওয়াফের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার হাদীছটিও

একথার প্রমাণ বহন করে *(বুখারী, হা/১৬০৭; মুসলিম, হা/৩০৭৩)*।

চুম্বন বা স্পর্শ করার জন্য হাজারে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছতে হলে যদি কাউকে কষ্ট দেওয়া লাগে, তবে সেখানে যাবে না; বরং ইশারা করে ত্বওয়াফ চালিয়ে যাবে। কেননা পাথর স্পর্শ করা উত্তম, কিন্তু মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। আর কোনো হারাম কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে কোনো উত্তম কাজের প্রতি ধাবিত হওয়া যাবে না।

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বন করার সময় বলবে, بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (**উচ্চারণ:** বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার), অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নামে চুমু দিচ্ছি বা স্পর্শ করছি। আল্লাহ মহান'। আর পাথরের দিকে ইশারা করার সময় বলবে, اللَّهُ أَكْبَر। 'আল্লাহ মহান'। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করেন। তিনি যখনই রুকন (হাজারে আসওয়াদ)-এর নিকটে আসছিলেন, তখনই কিছু একটা দিয়ে ইহার দিকে ইশারা করছিলেন এবং 'আল্লাহ আকবার'

বলছিলেন' *(বুখারী, হা/১৬১৩)*। পাথরটি স্পর্শ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' উভয়ই পড়ার প্রমাণে ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে ছহীহ সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী, ৫/৭৯)*। হাফেয ইবনে হাজার (রহেমাহুল্লাহ) বলেন *(আত-তালখীছুল হাবীর, ২/২৪৭)*, 'বায়হাক্বী এবং ত্বাবারানী 'আওসাত্ব' ও 'দো'আ' গ্রন্থে ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) এমর্মে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন, তখন বলতেন, «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» 'আল্লাহ্‌র নামে স্পর্শ করছি। আল্লাহ মহান'। হাদীছটির সনদ ছহীহ।

৫. ত্বওয়াফকারী যখন রুকনে ইয়ামানী বরাবর পৌঁছবে, তখন সহজ হলে হাত দিয়ে সে এটিকে স্পর্শ করবে; সে যেমন রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করবে না, তেমনি হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতও চুম্বন করবে না। পক্ষান্তরে তার পক্ষে যদি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সহজ না হয়, তবে তার দিকে ইশারা না করেই ত্বওয়াফ চালিয়ে যাবে। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ»

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত বায়তুল্লাহ্‌র অন্য কোথাও স্পর্শ করতে দেখিনি' *(বুখারী, হা/১৬০৯; মুসলিম,*

হা/৩০৬১)। এমর্মে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকেও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, হা/৩০৬৬)*।

মনে রাখতে হবে, রুকনে ইয়ামানীতে স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না; চুম্বন করা যাবে না, দো'আ পড়া যাবে না এবং ইশারা করাও চলবে না।

৬. রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত কা'বার অন্য কোন কোণ বা দেওয়ালের অন্য কোন স্থান স্পর্শ করা যাবে না। ইতোপূর্বে উল্লেখিত ইবনে ওমর এবং ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছদ্বয় একথার প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বলেন,

«طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ، فَقَالَ: أَمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ رَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُهُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ فَإِنَّ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً»

'আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর সাথে ত্বওয়াফ করলাম। আমি কা'বার রুকনে শামী বা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এসে সেটিকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাত ধরলাম। তিনি বললেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ত্বওয়াফ করোনি? আমি বললাম,

হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাঁকে এই কোণ স্পর্শ করতে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমিও সেটি স্পর্শ করো না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেই তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে’ *(আহমাদ, হা/২৫৩, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটির সনদ ছহীহ)*।

৭. স্পর্শ করা বৈধ কোণদ্বয় ব্যতীত কা‘বা ঘরের অন্য কোন কোণ এবং দেওয়াল যেমন চুম্বন বা স্পর্শ করা যাবে না, তেমনি পৃথিবীর অন্য কোন পাথর বা ভবন চুম্বন বা স্পর্শ করাও যাবে না। বরং সুন্নাত অনুযায়ী হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ওয়াজিব। সেজন্য ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছিলেন,

«وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না’। ইমাম নববী (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বর ত্বওয়াফ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ক্বরের দেওয়ালে পেট ও পিঠ লাগানো মাকরূহ। আবূ ওবায়দিল্লাহ হালীমীসহ অনেকেই একথা বলেন। তাঁরা বলেন,

দেওয়াল হাত দিয়ে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা বৈধ নয়। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে আসলে যেমন সে তাঁর থেকে দূরে থাকত, ঠিক এখনও তেমনি তাঁর থেকে দূরে থাকতে হবে; ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী এটিই হচ্ছে সঠিক কথা। বেশীর ভাগ মানুষের এই বক্তব্য বিরোধী আমলের কারণে কেউ যেন প্রতারিত না হয়। কেননা ছহীহ হাদীছ এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করতে হবে; সাধারণ জনতার বিদ'আতী কর্মকাণ্ড এবং মূর্খতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, তার সেই নবাবিষ্কৃত কর্ম প্রত্যাখ্যাত'। ছহীহ মুসলিমে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আমাদের প্রদর্শিত পথের বাইরে কোন আমল করল, তার সেই আমল প্রত্যাখ্যাত'। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ক্বরকে ঈদ অনুষ্ঠানের দৃশ্যে পরিণত করো না; বরং তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখান থেকেই দরূদ পাঠ করো না কেন, তা আমার নিকটে পৌঁছে যাবে' *(আবূ দাঊদ ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)*। ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, যার অর্থ হচ্ছে, 'হেদায়াতের পথের অনুসরণ কর, এ পথে

গমনকারীর সংখ্যা কম বলে তা তোমাকে কোনো ক্ষতি করবে না। পক্ষান্তরে তুমি বিভ্রান্তির পথ পরিহার করে চলো; ধ্বংস প্রাপ্তদের সংখ্যা বেশী বলে তাতে তুমি প্রতারিত হয়ো না’। যে ব্যক্তি মনে করবে, দেওয়াল স্পর্শ করলে বেশি বরকত হাছিল করা যাবে, বুঝতে হবে সেটি তার মূর্খতা এবং অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কেননা শরী‘আতের অনুসরণের মধ্যেই প্রকৃত বরকত নিহিত রয়েছে। সঠিক বিষয়ের বিরোধিতা করে কিভাবে অনুগ্রহ তালাশ করা সম্ভব! *(মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, ৮/২০৬)*।

ইমাম নববী (রহেমাহুল্লাহ) যে হাদীছটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা ছহীহ বুখারী *(হা/২৬৯৭)* ও মুসলিমে *(হা/৪৪৯২)* এসেছে, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, তার সেই নবাবিষ্কৃত কর্ম প্রত্যাখ্যাত’। ছহীহ মুসলিমে *(হা/৪৪৯৩)* অন্য শব্দে হাদীছটি এসেছে[16] এবং এটি প্রথম হাদীছটির তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এটি প্রত্যেকে

---

[16] মুসলিমের অপর শব্দ হচ্ছে, «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» এটি উপরে বর্ণিত শব্দ থেকেও ব্যাপক।

আমলকারীকেই অন্তর্ভুক্ত করে, চাই সে নতুন কাজটি নিজে আবিষ্কার করুক বা অন্য কারও আবিষ্কারের অনুগামী হয়েই কাজটি করুক, সর্বাবস্থায় সে এই হুকুমের আওতায় পড়ে যাবে।

ইবনে তায়মিইয়াহ (রহেমাহুল্লাহ) বলেন *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ২৭/৭৯)*, 'বিদ্বানগণ একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ববর বা অন্য কোনো নবী ('আলাইহিস্সালাম)-এর ক্ববর ও নেককারদের কবর যেমন, ছাহাবায়ে কেরাম ও আহলুল বাইতসহ অন্য কোন সৎমানুষের ক্ববর যিয়ারত করবে, সে তাঁদের ক্ববর স্পর্শ করবে না এবং চুমুও খাবে না। বরং দুনিয়াতে হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো জড়পদার্থ চুম্বন করা শরী'আতসম্মত নয়। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি যেমন কোনো ক্ষতি করতে পারো না, তেমনি কোনো উপকারও করতে পারো না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'। **সেকারণে বিদ্বানগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে বলা যায়, কারো জন্য কা'বার হিজ্রের নিকটবর্তী কোণাদ্বয়, কা'বার দেওয়াল, মাক্বামে ইবরাহীম, বায়তুল মাক্বদেসের**

পাথরখণ্ড এবং কোন নবী ও সৎমানুষের ক্ববর চুম্বন বা স্পর্শ করা বৈধ নয়।

৮. ত্বওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো'আ নেই। সুতরাং ত্বওয়াফকারী তার সহজসাধ্য যে কোনো দো'আর মাধ্যমে তার প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করবে এবং কুরআন তেলাওয়াত করবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত দো'আসমূহ পাঠ করা উত্তম। ত্বওয়াফকারী রুকনে ইয়ামানী এবং হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে,

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন' [সূরা আল-বাকারাহ:২০১] *(আহমাদ, হা/১৫৩৯৮; আবূ দাঊদ, হা/১৮৯২, সনদ হাসান)*।

কিছু কিছু মানুষ প্রত্যেক চক্করে আলাদা আলাদা দো'আ পড়ে থাকে, শরী'আতে যার কোনো দলীল নেই। এটি নবাবিষ্কৃত আমলসমূহের মধ্যে একটি।

৯. শুধুমাত্র ত্বওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করা উচিৎ এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা উচিৎ; অন্য সময়ে নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ত্বওয়াফ ছাড়া অন্য সময়ে এগুলি চুম্বন বা স্পর্শ করার কথা আসে নি। তবে জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছে বিদায় হজ্জে ত্বওয়াফের দুই রাক'আত ছালাত অন্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাজারে আসওয়াদ স্পর্শের কথা এসেছে *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হওয়ায় এটি উত্তম কাজ। অনুরূপভাবে কেউ যদি ত্বওয়াফের বাইরে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে, তবে তা জায়েয রয়েছে। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে সাব্যস্ত আছে,

«أَنَّهُ كَانَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ، كَانَ فِي طَوَافٍ، أَوْ فِي غَيْرِ طَوَافٍ»

'তিনি ত্বওয়াফের সময় বা ত্বওয়াফের বাইরে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করা পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের হতেন না' *(মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, আ/১৩৫৭১, ইবনু আবী শায়বাহ বুখারী ও মুসলিমের ওস্তাদ, হাদীছটি তাঁদের উভয়ের শর্ত সাপেক্ষ)*।

১০. ওমরার ত্বওয়াফে এবং ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর ত্বওয়াফে ক্বুদূমে 'ইযত্বেবা' করা উত্তম। ইযত্বেবা হচ্ছে, গায়ের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে উঠিয়ে দিয়ে ডান কাঁধ খালি রাখা। ত্বওয়াফকারী সাত চক্করেই ইযত্বেবা অবস্থায় থাকবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম জে'রানাহ থেকে ওমরা করেন। তাঁরা রমল করেন এবং তাঁদের গায়ের চাদর বগলের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপরে উঠিয়ে দেন' *(আবূ দাঊদ, হা/১৮৮৪, সনদ ছহীহ)*। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন,

«أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ»

'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ডোরা-কাটা চাদরে ইযত্বেবা অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র ত্বওয়াফ করেন' *(তিরমিযী, হা/৮৫৯, তিনি হাদীছটিকে 'হাসান-ছহীহ' বলেছেন)*।

শুধুমাত্র উল্লেখিত ত্বওয়াফেই ইযত্বেবা করতে হবে। ইযত্বেবার অবস্থা ব্যতীত ইহরামের বাক্বী সব অবস্থায় চাদর উভয় কাঁধের উপর থাকবে।

১১. ওমরার ত্বওয়াফ এবং ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর ত্বওয়াফে ক্বুদূমের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের জন্য 'রমল' করাও উত্তম। রমল হচ্ছে, ঘন ঘন ধাপে একটু জোরে চলা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম 'উমরাতুল ক্বাযা'-তে রমল করেছিলেন *(বুখারী, হা/১৬০২; মুসলিম, হা/৩০৫৯)*। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً»

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করে হজ্জ এবং ওমরার প্রথম ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে জোরে হাঁটতেন এবং পরের চার চক্করে স্বাভাবিক হাঁটতেন' *(বুখারী, হা/১৬০৩; মুসলিম, হা/৩০৪৯)*। জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, «حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا» 'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যখন বায়তুল্লাহতে পৌঁছলাম, তখন তিনি রুকন (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করলেন। অতঃপর ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে

রমল করলেন এবং পরের চার চক্করে স্বাভাবিক হাঁটলেন' *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

তবে মহিলাদের জন্য রমল নেই। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, মহিলাদের জন্য কোন রমল নেই; না বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফের সময়, না ছাফা-মারওয়ায় সা'ঈর সময়' *(আল-ইজমা/৬১)*।

১২. রমল করার কারণ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) ৭ম হিজরীতে 'উমরাতুল ক্বাযা' আদায় করতে আসলে মুশরিকরা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলে, إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ 'তোমাদের নিকট এমন এক সম্প্রদায় আগমন করেছে, যাদেরকে ইয়াছরিবের জ্বর দুর্বল করে ফেলেছে'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) কে কাফেরদের সামনে তাঁদের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রথম তিন চক্করে রমল করার আদেশ করেন' *(বুখারী, হা/১৬০২; মুসলিম, হা/৩০৫৯)*। ঘটনাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীছটির বাস্তব প্রয়োগ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» 'একটি মাত্র ধোঁকা দ্বারাই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়' বা 'যুদ্ধ ধোঁকা দেয়' বা 'যুদ্ধে ধোঁকা চলে' *(বুখারী, হা/৩০৩০; মুসলিম, হা/৪৫৩৯)*। তবে

বিদায় হজ্জে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) রমল করার কারণে এই হুকুমটি স্থায়ী হয়ে যায়। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) এবং জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছে এমর্মে বর্ণিত হয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, ‘আমরা কেন এখন রমল করি? আমরাতো (সেদিন) মুশরিকদেরকে দেখানোর জন্য রমল করেছিলাম; কিন্তু আল্লাহতো তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন’। অতঃপর তিনি বললেন,

«شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ»

‘যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি করেছেন, সেহেতু আমরা তা ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করি না’ *(বুখারী, হা/১৬০৪)*।

১৩. কেউ যদি চক্কর সংখ্যা ভুলে যায়, তাহলে প্রবল ধারণার উভর নির্ভর করবে। অন্যথায় কম সংখ্যার উপর নির্ভর করবে। যেমনঃ যদি পাঁচ চক্কর দেয়, কিন্তু পঞ্চম চক্কর নিয়ে সন্দেহ হয়: সেটি কি পঞ্চম চক্কর নাকি ষষ্ঠ! এক্ষেত্রে যদি তার সন্দেহ প্রবল হয় যে, সেটি ষষ্ঠ, তাহলে সেটিকে ষষ্ঠ ধরে নিয়ে এরপরে আরেকটি চক্কর দিবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো দিকেই তার

সন্দেহ প্রবল না হয়, তাহলে কম সংখ্যকটা ধরে নিয়ে এরপরে আর দু’টি চক্কর দিবে।

ত্বওয়াফরত অবস্থায় যদি ছালাতের ইক্বামত দিয়ে দেয়, তাহলে সে আগে ছালাত আদায় করে নিবে এবং যেখানে ছালাত আদায় করেছে, সেখান থেকে ত্বওয়াফের বাক্বী অংশ পূরণ করবে। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে ‘ইজমা’ উল্লেখ করেছেন *(আল-ইজমা/৬২)*।

১৪. ত্বওয়াফ শেষে সহজ হলে ত্বওয়াফকারীর জন্য মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাছ দিয়ে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা উত্তম। আর সহজ না হলে মসজিদের যে কোনো স্থানে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছে এর প্রমাণ এসেছে *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

«قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا»

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ্‌র সাতটি ত্বওয়াফ করলেন এবং মাক্বামে ইবরাহীমের

পেছনে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন’ *(বুখারী, হা/১৬২৭; মুসলিম, হা/২৯৯৯)*।

যমযম পানি পান

১. যমযম পানি পান করা উত্তম। মহান আল্লাহ এই পানি ইসমাঈল (‘আলাইহিস্‌সালাম) এবং তাঁর মা হা-জার (هَاجَرُ) এর জন্য প্রবাহিত করেন; যেটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং অশেষ কৃপায় অদ্যাবধি চালু রয়েছে। ঘটনাটি ছহীহ বুখারীতে এসেছে *(হা/৩৩৬৪)*। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে ত্বওয়াফ এবং মাক্বামে ইবরাহীমের পেছনে ছালাত অন্তে যমযম পানি পান করেন এবং মাথায় দেন *(আহমাদ, হা/১৫২৪৩, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটির সনদ ছহীহ)*। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের শেষে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে এই পানি পান করেন *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

২. যমযম পানির ফযীলত বর্ণনায় ছহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে একটি দীর্ঘ হাদীছে এসেছে,

«إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»

'এটি বরকতময়। এটি খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ' *(মুসলিম, হা/৬৩৫৯)*। আবূ দাঊদ ত্বয়ালাসী তাঁর 'মুসনাদ'-এ মুসলিমের সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং তিনি নিম্নোক্ত বাক্যটি উল্লেখ করেন, «وشِفاءُ سقْمٍ» 'আর এটি ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ' *(হা/৪৫৯)*।

জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটিও এই পানির ফযীলত বর্ণনা করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» 'যমযম পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, সে উদ্দেশ্যই পূরণ হবে' *(ইবনে মাজাহ, হা/৩০৬২, হাদীছটিকে কেউ কেউ 'হাসান', আবার কেউ কেউ 'ছহীহ' বলেছেন; দেখুন: (ইরওয়াউল গালীল, হা/১১২৩)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'যমযম পানি হচ্ছে পানির সরদার। এটি যেমন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পানি, তেমনি তা মানুষের নিকটে প্রিয়তর। এটি মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান পানি' *(যাদুল মা'আদ, ৪/৩৯২)*।

৩. হজ্জ ও ওমরা পালনকারী পান করার, আরোগ্য লাভ করার এবং অন্যকে উপহার দেওয়ার জন্য বেশী করে যমযম পানি সঙ্গে নিতে পারে। এই পানি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। কেননা এটি বরকতময় এবং ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ পানি। আয়েশা

(রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) সঙ্গে করে যমযম পানি নিয়ে আসতেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই পানি সঙ্গে করে আনতেন *(তিরমিযী, হা/৯৬৩, সনদ ‘হাসান’)*।

ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ

১. ওমরাকারী ওমরার ত্বওয়াফ শেষে ছাফা-মারওয়ায় ত্বওয়াফ করতে যাবে। অনুরূপভাবে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ আদায়কারী ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে সা‘ঈ করবে। তবে তারা ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পর পর্যন্ত এই সা‘ঈ পিছিয়ে দিতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিরান হজ্জ করেন এবং ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করেন *(মুসলিম, হা/২৯৫০, জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত)*। হজ্জ ও ওমরার রুকনসমূহ আলোচনার সময় আমরা সা‘ঈর হুকুম বর্ণনা করেছি। ত্বওয়াফ এবং সা‘ঈ অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করা উত্তম। তবে কোন প্রয়োজনে ত্বওয়াফের পরে সা‘ঈকে বিলম্বিত করা যাবে।

২. ছাফা এবং মারওয়ায় সাতবার সা‘ঈ করতে হবে। ছাফা থেকে শুরু হবে এবং মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে। ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত আরেক চক্কর। সেজন্য ছাফা থেকে যে চক্করগুলি হবে, সেগুলি সব হবে বিজোড়। আর সেগুলি হচ্ছে চার চক্কর, যথা: ১ম, ৩য়, ৫ম এবং ৭ম। পক্ষান্তরে মারওয়া থেকে যে চক্করগুলি হবে, সেগুলি হবে জোড়। সেগুলি হচ্ছে তিন চক্কর, যথা: ২য়, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ। সা‘ঈ শুরু করার জন্য যখন ছাফার নিকটবর্তী হবে, তখন পড়বে,

﴿ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٥٨]

‘নিঃসন্দেহে ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম’ *(বাক্বারাহ ১৫৮)* এবং বলবে, ‘যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন, তা দিয়ে আমরাও শুরু করছি। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন *(মুসলিম, হা/২৯৫০, জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত)*। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ছাফা ও মারওয়ার কথা উল্লেখ করার সময় আগে ছাফার কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, আল্লাহ যেটিকে আগে উল্লেখ করেছেন, আমরা সেখান থেকেই আমাদের সা‘ঈ শুরু করব। প্রত্যেকটি চক্করের সময় ছাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পুরো এলাকা জুড়ে চক্কর হতে হবে। সবুজ বাতির

মধ্যবর্তী জায়গা, যেখানে পূর্বে উপত্তকার কোল ছিল, সেখানে জোরে চলতে হবে এবং বাক্বী সবখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হবে *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। সা‘ঈ সম্পাদনকারী প্রত্যেক চক্করে ছাফা এবং মারওয়ার উপরে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও বড়ত্ব বর্ণনা করবে। সে বলবে,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

‘শরীকবিহীন এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব মা‘বূদ নেই। তাঁরই সকল রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক্ব মা‘বূদ নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন’। এরপর যত ইচ্ছা দো‘আ করবে। এভাবে তিনবার করবে *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

মনে রাখতে হবে, সা‘ঈর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নেই। বরং সা‘ঈ সম্পাদনকারী তাঁর প্রভুর নিকটে প্রাণ খুলে প্রার্থনা করবে এবং কুরআন পড়বে। যেমনটি পূর্বে ত্বওয়াফের ব্যাপারেও বর্ণিত হয়েছে।

৩. ছাফা-মারওয়ার সা‘ঈর জন্য অযু অবস্থায় থাকা শর্ত নয়। কেননা এমর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘সবাই একমত পোষণ করেছেন যে, অযূবিহীন অবস্থায় ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করলে তা শুদ্ধ হবে’ *(আল-ইজমা/৬৩)*।

৪. সা‘ঈ মূলতঃ ইসমাঈল (‘আলাইহিস্‌সালাম)-এর মা হা-জারের কর্ম থেকেই শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে; ঘটনা বর্ণনা শেষে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا»

‘আর এটিই হচ্ছে এই পাহাড়দ্বয়ে লোকদের সা‘ঈ করার ইতিহাস’ *(হা/৩৩৬৪)*।

৫. হজ্জ ও ওমরা ছাড়া অন্য সময়ে সা‘ঈ করা যাবে না। আমরা আগেই বলেছি যে, এটি হজ্জ ও ওমরার একটি রুকন। কোনো নফল সা‘ঈ করা যাবে না। কেননা এমর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। তবে নফল ত্বওয়াফ করা যাবে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে নীচের আয়াতাংশের অর্থ কি?

﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨﴾ [البقرة: ١٥٨]

‘কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দিবেন’। জবাব হল, এখানে স্বেচ্ছায় নেকীর কাজ বলতে নফল সা‘ঈ বুঝানো হয় নি; বরং নফল হজ্জ বা ওমরা বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আয়াতের অর্থ হচ্ছে, কেউ যদি তার ওয়াজিব হজ্জ সম্পাদন করার পর নফল হজ্জ বা ওমরা করে, তাহলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নফল কাজ করার কারণে তিনি তাকে এর যথাযথ পুরষ্কার দিবেন এবং তিনি তার নফল ইবাদতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত আছেন’। হাফেয ইবনে হাজার ইমাম ত্বহাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٥٨]

‘আয়াত দ্বারা যে ব্যক্তি বলতে চায় যে, সা‘ঈ মুস্তাহাব, এতে তার পক্ষে কোনো দলীল নেই। কেননা আয়াতটি মূল হজ্জ ও ওমরাকে বুঝিয়েছে; এককভাবে সা‘ঈকে বুঝায় নি। কারণ সকল মুসলিম একমত পোষণ করেছেন যে, হজ্জ ও ওমরা পালনকারী ব্যতীত অন্যের জন্য সা‘ঈ করা শরী‘আতসম্মত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন’ *(ফাতহুল বারী, ৩/৪৯৯)*। ইমাম নববী (রহেমাহুল্লাহ) জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “অনুচ্ছেদ: ‘সা‘ঈ বারবার করা যাবে না”

জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) এর বাণী, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ছাফা-মারওয়ায় একটির বেশী সা'ঈ করেন নি'। অর্থাৎ প্রথম সা'ঈ। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, হজ্জ বা ওমরায় সা'ঈর পুনরাবৃত্তি করা যাবে না; বরং একবার করেই ক্ষান্ত করতে হবে। সা'ঈর পুনরাবৃত্তি করা বৈধ নয়। কেননা ইহা বিদ'আত *(শারহু ছহীহি মুসলিম, ৯/২৪)*।

আবার কেউ কেউ উক্ত ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرًا﴾ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে স্বেচ্ছায় নেকীর কাজ করা বলতে যেসব ক্ষেত্রে নফল ইবাদত বৈধ করা হয়েছে, সেগুলিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন: ছালাত, দান, ছিয়াম, হজ্জ, ওমরা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। শায়খ আব্দুর রহমান সা'দী (রহেমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এই অর্থ করার পর বলেন, 'এটা প্রমাণ করে যে, বান্দা যতবেশী আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে পারবে, ঈমান বাড়ার কারণে আল্লাহ্‌র নিকট তার কল্যাণ, পূর্ণতা এবং মর্যাদা ততবেশী বৃদ্ধি পাবে। আর 'কল্যাণকর কাজ স্বেচ্ছায় করা' এর শর্তটি জুড়ে দেয়া প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অননুমোদিত বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করবে, সে পরিশ্রম বৈ কোন কল্যাণই অর্জন করতে পারবে না। বরং যদি এমন কর্মের

অবৈধতা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে, তাহলে তা তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে’।

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা

১. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেটে ফেলা হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিবসমূহের একটি। আমরা ‘হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিবসমূহ’ আলোচনার সময় দলীল-প্রমাণসহ এ বিষয়ে কথা বলেছি।

২. হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করা চুল ছাটার চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর ওমরা ব্যতীত অন্য ওমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্যও মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। তবে তামাত্তু হজ্জ পালনকারী যদি এমন সময় ওমরা থেকে হালাল হয়, যখন মাথা ন্যাড়া করলে হজ্জের পূর্বে তার মাথার চুল আবার গজানোর সুযোগ পাবে, তাহলে তার ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডনই উত্তম। আর হজ্জের খুব কাছাকাছি সময়ে ওমরা থেকে হালাল হলে চুল ছাটাই উত্তম। কেননা কিছু চুল তার মাথায় অবশিষ্ট থাকলে হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার সময় সে তা চেঁছে ফেলতে পারবে। তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ছাহাবীগণ ৪ যুল-হিজ্জায় রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যখন মক্কায় পৌঁছেন, তখন তাঁরা ওমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন না করে চুল ছেটে ফেলেন। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু)-এর হাদীছে বলা হয়েছে,

«فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ»

‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ যাঁদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাঁরা ব্যতীত সবাই চুল ছেটে হালাল হয়ে গেলেন’ *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। হাদীছে উল্লেখিত উক্ত অবস্থা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের মাগফেরাতের জন্য তিনবার দো‘আ করেছেন এবং কর্তনকারীদের জন্য একবার দো‘আ করেছেন *(বুখারী, হা/১৭২৮; মুসলিম, হা/৩১৪৮)*। তাছাড়া চুল ছেটে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য শোভাবর্ধন বর্জনের বিষয়টিতো রয়েছেই।

৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটার ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্পূর্ণ মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে অথবা ছেটে ফেলতে হবে। মাথার কিছু অংশের চুল ছাটলে এবং কিছু অংশের চুল ছেড়ে দিলে তা যথেষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে কিছু অংশের চুল ন্যাড়া করে

অবশিষ্টাংশের চুল ছেড়ে দিলে তাও যথেষ্ট হবে না। কাঁচি বা ইলেক্ট্রিক যন্ত্র দ্বারা চুল ছাটবে; আর ক্ষুর বা ব্লেড দ্বারা মাথা মুণ্ডন করবে।

মহিলারা চুলের মাথা থেকে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ কেটে ফেলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» 'মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডনের বিধান নেই। বরং তাদেরকে চুল ছেটে ফেলতে হবে' *(আবূ দাঊদ, হা/১৯৮৫, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত, সনদ 'ছহীহ')*। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, 'সবাই একমত যে, মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডনের বিধান নেই' *(আল-ইজমা/৬৬)*।

৪. মুহরিম ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরা থেকে হালাল হওয়ার সময় নিজে যেমন নিজের মাথার চুল ছাটতে পারে বা মুণ্ডন করতে পারে, তেমনি হালাল হওয়ার জন্য অন্যের মাথার চুলও ছেটে দিতে পারে বা মুণ্ডন করে দিতে পারে। কেননা মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা হজ্জ বা ওমরার ওয়াজিবসমূহের একটি। সুতরাং এ সময় এটি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না।

৮ তারিখে মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন

১. মক্কাবাসীরা এবং মক্কায় অবস্থানরত অন্যান্যরা যুল-হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে অর্থাৎ তারবিয়ার দিন তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর মিনায় গিয়ে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের ছালাত ক্বছর করে আদায় করবে; জমা করে নয়। যে সকল ছাহাবী ওমরা থেকে হালাল হয়েছিলেন, তাঁরা এবং অন্যান্য মক্কাবাসীরা এমনটিই করেছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাঁদের সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, তাঁরা ইহরাম অবস্থাতেই ছিলেন।

যে ব্যক্তি ৮ তারিখের পূর্বে মিনায় যাবে, সে মিনা থেকেই ইহরাম বাঁধবে; ইহরাম বাঁধার জন্য তাকে মক্কায় যেতে হবে না।

২. মক্কাবাসী বা অন্যান্য যারাই মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে, তাদেরকে যেমন ইহরাম বাঁধার জন্য মসজিদে হারামে যেতে হবে না, তেমনি হজ্জে যাওয়ার জন্য বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় স্বরূপ ত্বওয়াফও করতে হবে না। অনুরূপভাবে হজ্জের সা'ঈও

আগেভাগে করে নিবে না। বরং ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পর সা'ঈ করবে। কেননা যে সকল ছাহাবী মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন, তাঁরা কেউ এমনটি করেন নি; বরং তাঁরা ইহরাম বেঁধে মিনায় চলে গিয়েছিলেন।

৩. হজ্জে ছালাত ক্বছর এবং জমা করে আদায়ের ক্ষেত্রে বহিরাগত এবং মক্কাবাসী হাজী সবাই সমান। কেননা যেসব মক্কাবাসী রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন, তাঁদেরকে তিনি ছালাত পূর্ণ করতে বলেন নি। যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) মক্কায় ছালাতের ইমামতি করেন এবং দুই রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের ছালাত পূর্ণ কর। কেননা আমরা মুসাফির। অতঃপর তিনি মিনায় গিয়ে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সেখানে তিনি মক্কাবাসীদেরকে এমন কিছু বলেছিলেন মর্মে আমাদের কাছে কোন বর্ণনা আসেনি' *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, ১/৪০৩, সনদ 'ছহীহ')*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তিনি মক্কায় থাকা অবস্থায় মক্কাবাসীদেরকে ছালাত পূর্ণ করার আদেশ সম্বলিত মারফূ হাদীছটির সনদ দ্বঈফ বা দুর্বল *(আবূ দাঊদ, হা/১২২৯)*।

হজ্জে মক্কাবাসীদের জন্য ছালাত ক্বছর এবং জমা করে আদায়ের বিধান হজ্জের কারণে; সফরের কারণে নয়। সেজন্য কোনো মক্কাবাসী যদি ইহরামবিহীন অবস্থায় হাজীদের সাথে বের হয়, তাহলে সে ক্বছর বা জমা কোনোটিই করতে পারবে না।

৪. তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে কেউ যদি হজ্জের ইহরাম বাঁধে, অতঃপর তার স্মরণ হয় যে, সে ওমরার ত্বওয়াফ বা সা'ঈ করে নি অথবা ত্বওয়াফ বা সা'ঈর এক বা একাধিক চক্কর ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে সে ক্বিরান হজ্জ পালনকারীতে পরিণত হবে। কেননা হজ্জের কার্যাবলী শুরু করার কারণে তার পক্ষে আর ওমরা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) ঋতুগ্রস্ত হওয়ার কারণে হজ্জের পূর্বে ওমরা করতে সক্ষম না হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে বলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি ক্বিরান হজ্জ আদায়কারিণীতে পরিণত হন *(বুখারী, হা/৩০৫; মুসলিম, হা/২৯১৯)*।

তবে তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ওমরার ত্বওয়াফ ও সা'ঈ করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটার আগে যদি হজ্জের ইহরাম বেঁধে ফেলে, তাহলে সে তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীই থাকবে। তবে ওমরার একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাকে ফিদ্ইয়া

দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া হচ্ছে, একটি ছাগল কুরবানী করা অথবা একটি উট বা একটি গরুতে সাতজনের এক অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ করা। ফিদ্ইয়ার গোশত হারাম এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে, তা থেকে সে নিজে একটুও খাবে না।

৫. আরাফার রাতে মিনায় রাত্রিযাপন করা মুস্তাহাব। এ রাতে কেউ যদি মিনায় না থাকে, তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না মর্মে ইবনুল মুনযির 'ইজমা' উল্লেখ করেছেন *(আল-ইজমা/৬৪)*।

আরাফায় অবস্থান

১. আরাফার দিবসে সূর্য উঠার পরে মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া উত্তম *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। আরাফায় যাওয়ার সময় হাজীরা 'আল্লাহু আকবার' এবং তালবিয়া পড়তে পড়তে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ»

‘আমরা ভোরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিনা থেকে আরাফায় গিয়েছিলাম; আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তালবিয়া পড়ছিলেন, আবার কেউ কেউ ‘আল্লাহু আকবার’ বলছিলেন’ *(মুসলিম, হা/৩০৯৫)*। আনাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘আপনারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই দিনে কি করছিলেন? জবাবে তিনি বলেন,

«كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ»

‘আমাদের কেউ কেউ তালবিয়া পড়ছিলেন, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন না। আবার কেউ কেউ ‘আল্লাহু আকবার’ বলছিলেন, কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন না’ *(বুখারী, হা/১৬৫৯; মুসলিম, হা/৩০৯৭)*।

২. আরাফায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করবে। হাজী ছাহেবের অবস্থান আরাফার সীমানার মধ্যে হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত যরূরী। আরাফার সীমানা নিরূপক সাইনবোর্ডগুলির মাধ্যমে সে তার অবস্থান জানতে পারবে। মনে রাখতে হবে, আরাফায় অবস্থান হজ্জের একটি রুকন, যা ছেড়ে দিলে হজ্জই সম্পন্ন হবে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْحَجُّ عَرَفَةُ» ‘আরাফায় অবস্থানই হচ্ছে হজ্জ’। হজ্জ ও ওমরার রুকনসমূহ আলোচনার সময় এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছি।

৩. আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে কুরবানীর রাতের ফজর (সুবহে সাদিক) উদয় হওয়া পর্যন্ত আরাফায় অবস্থানের সময়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে আরাফায় অবস্থান করেছেন *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। আবার কেউ কেউ বলছেন, আরাফার দিন ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে আরাফায় অবস্থানের সময় শুরু হয়। উরওয়াহ ইবনে মুদ্বাররিস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন,

«أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَوْقِفِ -يَعْنِي بِجَمْعٍ- قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»

‘আমি মুযদালিফায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ত্বাই গোত্র থেকে এসেছি, আমি আমার বাহনটিকে দুর্বল করে ফেলেছি এবং আমার নিজেকে করে ফেলেছি ক্লান্ত। আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কোনো পাহাড় বা টিলা ছেড়ে আসি নি,

যেখানে অবস্থান করি নি। তাহলে কি আমার হজ্জ হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এই ছালাত (ফজর) পেল এবং এর পূর্বে রাতে বা দিনে আরাফায় আসল, তার হজ্জ পূর্ণ হল এবং হালাল হওয়ার পর যা করা যায়, সে যেন তা করল’ *(আবূ দাঊদ, হা/১৯৫০, সনদ ‘ছহীহ’)*। যদিও আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে আরাফায় অবস্থান করলে চলবে, তথাপিও কেউ যেন উক্ত অবস্থানকেই যথেষ্ট মনে না করে; বরং সূর্য ঢলে যাওয়ার পরও অবস্থান করে।

৪. যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করবে, সে সূর্যাস্তের পরে সেখান থেকে প্রস্থান করবে; সূর্যাস্তের আগে নয় *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। হজ্জ ও উমরার ওয়াজিব বর্ণনায় তার আলোচনা চলে গেছে।

৫. হাজীরা আরাফায় যোহরের প্রথম ওয়াক্তে এক আযান ও দুই এক্বামতে জমা-ক্বছর করে যোহর এবং আছরের ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*। ছালাতের পূর্বে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক জনগণের উদ্দেশ্যে খুৎবা দেওয়া উত্তম। এই খুৎবায় তিনি হজ্জের অবশিষ্ট বিধিবিধান এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা রাখবেন *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

৬. আরাফায় হাজীদের ছওম পালন না করাই ভাল। কেননা এর মাধ্যমে তারা এই মহান দিনে বেশী বেশী দো‘আ ও যিকর-আযকার করার শারীরিক শক্তি অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া নবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও এদিনে ছওম পালন করেন নি। উম্মুল ফাদ্বল বিনতে হারেছ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন,

«أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ»

‘একদল লোক তাঁর নিকটে আরাফার দিনে রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছওম নিয়ে মতভেদ করছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ বলছিলেন, তিনি ছওমরত অবস্থায় আছেন। আবার কেউ কেউ বলছিলেন, তিনি ছওমরত অবস্থায় নন। অতঃপর তিনি (উম্মুল ফাদ্বল) রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় তাঁর নিকটে এক পেয়ালা দুধ দিয়ে পাঠালেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন’ *(বুখারী, হা/১৯৮৮; মুসলিম, হা/২৬৩২)*।

তবে হাজীরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য এদিন ছওম পালন করাই উত্তম; বরং নফল ছওমের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার দিনে ছওম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» 'ইহা পূর্বের এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের (ছগীরাহ) গোনাহসমূহের কাফফারাহ হয়' *(মুসলিম, হা/২৭৪৭)*। ছহীহ মুসলিমের অন্য শব্দে হাদীছটি এসেছে এভাবে,

«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশা করি, তিনি আরাফার ছওমের মাধ্যমে এই দিনের পূর্ববর্তী এক বছরের এবং পরবর্তী এক বছরের (ছগীরাহ) গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন' *(হা/২৭৪৬)*।

৭. ক্বিবলামুখী হয়ে আরাফার ময়দানের যে কোনো স্থানে অবস্থান করলেই চলবে। এই মহান দিবসে বেশী বেশী করে তালবিয়া, দো'আ ও যিকর-আযকার করতে হবে। দো'আ করার সময় মহান আল্লাহ্‌র নিকট কাকুতি-মিনতি পেশ করতে হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় যিন্দেগীর সার্বিক কল্যাণ প্রার্থনা

করতে হবে। হাজীরা যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট খাটিঁ তওবার মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করবে। পক্ষান্তরে এর মাধ্যমে শয়তানকে করবে পরাস্ত, লাঞ্ছিত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই মহান দিবসে আরাফার ময়দানে ঘুরাফেরা করে এবং ‘জাবালে রহমত’ নামক পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। কেননা এই পাহাড়ে উঠার কোনো দলীল নেই।

৮. ইবাদতের উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানের অবস্থান হচ্ছে মুসলিমদের সর্ববৃহৎ মিলনমেলা। এই অবস্থানের মাধ্যমে একজন মুসলিম ক্বিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে পূর্ব ও পরের সকল মানুষের সমাবেশের কথা স্মরণ করবে এবং সৎআমল দ্বারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৯. আরাফায় অবস্থান এবং এই দিবসের ফযীলত বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ»

‘আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিনে মহান আল্লাহ এতবেশী সংখ্যক বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন না। তিনি এই দিন কাছাকাছি চলে আসেন এবং বান্দাদেরকে

নিয়ে গর্ব করে ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেন, ওরা কি চায়?' *(মুসলিম, হা/৩২৮৮, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত)*।

এই দিনে দো'আ করার ফযীলত বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

'সর্বশ্রেষ্ঠ দো'আ হচ্ছে আরাফার দিবসের দো'আ। আমি এবং নবীগণ সর্বোত্তম যে দো'আটি করেছি, তা হচ্ছে এই, «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ***(উচ্চারণ:*** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর),* অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ক মা'বূদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হাদীছটি 'হাসান লিগায়িরিহী', আলবানী (রহেমাহুল্লাহ) প্রণীত 'সিলসিলাহ ছহীহাহ্র ১৫০৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)*।

আরাফায় দো‘আ করার সময় দুই হাত উঠিয়ে দো‘আ করার কথা হাদীছে এসেছে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

«كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»

‘আরাফায় (উটের পিঠে) আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে ছিলাম। তিনি দুই হাত উঠিয়ে দো‘আ করেন। তাঁর উটটি একটু ঝুঁকে পড়লে উটের লাগাম পড়ে যায়। অতঃপর তিনি এক হাত উত্তোলিত অবস্থায় অপর হাত দিয়ে লাগামটি উঠান’ *(নাসা‘ঈ, হা/৩০১১, সনদ ‘ছহীহ’)*।

আরাফায় দো‘আ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো‘আ নেই। হজ্জ পালনকারী তার প্রভুর যিকর-আযকার করবে, তালবিয়া পাঠ করবে, তার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করবে, কুরআন তেলাওয়াত করবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো‘আসমূহ পড়া উচিৎ। কেননা এই দো‘আগুলি যেমন ব্যাপক অর্থবোধক, তেমনি এগুলিতে রয়েছে দো‘আয় ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায়।

এখানে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থেকে কতিপয় দো‘আ উল্লেখ করা যথোপযুক্ত মনে করছি। আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থানকালে, ত্বওয়াফ ও সা‘ঈতে এবং সর্বাবস্থায় উক্ত

দো‘আসমূহের মাধ্যমে একজন মুসলিমের প্রার্থনা করা উচিৎ। এসব দো‘আর মাধ্যমে সে ছালাতের সেজদাতে এবং সালাম ফিরানোর আগে প্রার্থনা করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

«أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

‘সাবধান! রুকূ এবং সেজদারত অবস্থায় আমাকে কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে রুকূতে তোমরা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব বর্ণনা কর এবং সেজদায় বেশী বেশী দো‘আ করার চেষ্টা কর। কেননা এটি তোমাদের দো‘আ ক্ববূলের বেশি উপযুক্ত’ *(মুসলিম, হা/১০৭৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বর্ণিত তাশাহ্‌হুদের বিবরণ সম্বলিত হাদীছের শেষাংশে এসেছে,

«ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ اَلدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو»

‘অতঃপর সে তার পছন্দমত দো‘আ চয়ন করে তা দিয়ে দো‘আ করবে’ *(বুখারী, হা/৮৩৫; মুসলিম, হা/৮৯৮)*। ইমাম আবূ দাঊদ (রহেমাহুল্লাহ) ‘ছালাতে দো‘আ’ অনুচ্ছেদের ৮৮৪ নং হাদীছের পরে বলেন, ‘ইমাম আহমাদ বলেছেন, ফরয ছালাতে কুরআনের দো‘আ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ দ্বারা দো‘আ করা আমার নিকট পছন্দনীয়’। ইহা রুকূ ও সেজদায় নিষিদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতের

অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে না; বরং তা দো‘আ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি সেজদায় পড়ে,

﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ۝٢٥ ﴾ [طه: ٢٥]

অথবা

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي﴾ [القصص: ١٦]

তাহলে তাকে তেলাওয়াতকারী বলা হবে না; বরং সে দো‘আকারী হিসাবে গণ্য হবে।

নীচে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত কতিপয় যিক্‌র-আযকার ও দো‘আ উল্লেখ করা হল, যেগুলির মাধ্যমে আরাফাসহ অন্যান্য যেকোন স্থানে দো‘আ করা যাবেঃ

- ﴿ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ۝١٢٩ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

*(**উচ্চারণ:** হাসবিয়াল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া, ‘আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রব্বুল আরশিল আযীম),*

অর্থ: ‘আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কোনো (হক্ব) মা‘বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের রব্ব’ *(তওবাহ ১২৯)*।

• ﴿ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]

*(**উচ্চারণ:** ফাতা‘আ-লাল্লা-হুল মালিকুল হাক্ব, লা- ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, রব্বুল আরশিল কারীম)*

অর্থ: ‘অতএব, শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (হক্ব) মা‘বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের রব্ব’ *(আল-মুমিনূন ১১৬)*।

• ﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ﴾ [النمل: ٥٩]

*(**উচ্চারণ:** আল-হামদু লিল্লা-হি ওয়া সালা-মুন ‘আলা- ইবা-দিহিল্লাযীনাছ্ত্বফা-)*

অর্থ: ‘সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি’ *(নামল ৫৯)*।

• ﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١ ﴾ [سبا: ١]

*(**উচ্চারণ:** আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা- ফিস্সামাওয়া-তি ওয়ামা- ফিল-আরযি, ওয়ালাহুল হাম্দু ফিলআ-খিরতি, ওয়াহুওয়াল হাকীমুল খাবীর),*

অর্থ: ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক। তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত’ *(সাবা ১)*।

• ﴿حَسْبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [الزمر: ٣٨]

*(**উচ্চারণ:** হাসবিয়াল্লা-হু ‘আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল মুতাওয়াক্কিলূন),*

অর্থ: ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তাঁরই উপর ভরসা করে’ *(যুমার ৩৮)*।

• ﴿قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَاۖ﴾ [الملك: ٢٩]

*(**উচ্চারণ:** হুওয়ার্‌ রহমা-নু আ-মান্না- বিহী ওয়া ‘আলাইহি তাওয়াক্কালনা-),*

অর্থ: ‘তিনিই পরম করুণাময়। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি’ *(মুলক ২৯)*।

• «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

***(উচ্চারণ:** লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু, ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর),*

অর্থ: ‘আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) মা‘বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।[17]

- «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

***(উচ্চারণ:** লা- হাওলা ওয়ালা- ক্বুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ),*

অর্থ: ‘নেই কোন ক্ষমতা এবং নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত’।[18]

- «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»

***(উচ্চারণ:** হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি‘মাল ওয়াকীল),*

---

17 তিরমিযী, হা/৩৫৮৫, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হাদীছটি ‘হাসান লিগায়িরিহী’ (দেখুন: আলবানী (রহঃ) প্রণীত সিলসিলাহ ছহীহাহ, হা/১৫০৩)।

18 বুখারী, হা/৪২০২; মুসলিম, হা/৬৮৬৮, আবূ মূসা আশ‘আরী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, উক্ত হাদীছে এই বাক্যটিকে জান্নাতের সঞ্চিত ধন বলা হয়েছে।

অর্থ: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না চমৎকার রক্ষাকারী'।[19]

- «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»

***(উচ্চারণ:** সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম),*

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রশংসা আদায় করছি। আমি মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।[20]

- «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

***(উচ্চারণ:** সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার),*

---

19 বুখারী, হা/৪৫৬৩, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে।

20 বুখারী, হা/৬৬৮২; মুসলিম, হা/৬৮৪৬, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত। হাদীছটির শব্দগুলি এরূপ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» 'এমন দু'টি বাক্য আছে, যা মুখে বলতে সহজ, অথচ দাড়িপাল্লায় তা ভারী এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। বাক্য দু'টি হচ্ছে, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ।

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই নিমিত্তে। আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ক) মা'বূদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়'।[21]

- «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

(উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খল্‌ক্বিহী ওয়া রিযা- নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহ্‌),* **অর্থ:** 'আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি তাঁর সৃষ্টিকুলের সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর সত্ত্বার সন্তুষ্টির সমতুল্য এবং তাঁর আরশের ওযন ও কালেমাসমূহের ব্যাপ্তি সমপরিমাণ'।[22]

- «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ»

(উচ্চারণ: *লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, আল্লা-হু আকবারু কাবীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাছীরান, সুবহা-নাল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্বুওওয়াতা*

---

21 মুসলিম, হা/৫৬০১, সামুরাহ ইবনে জুনদাব (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, হাদীছটিতে উক্ত চারটি বাক্যকে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় বলা হয়েছে।

22 মুসলিম, হা/৬৯১৩, জুওয়াইরিইয়া (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত।

ইল্লা- বিল্লা-হিল আযীযিল হাকীম, আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুক্বনী),

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। যাবতীয় এবং অগণিত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নেই কোন ক্ষমতা এবং নেই কোন শক্তি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিযিক্ব দান করুন'।[23]

- «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً»

***(উচ্চারণ:** রযীতু বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দ্বীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন রাসূলা),*

অর্থ: 'আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহকে রব্ব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে'।[24]

---

23 মুসলিম, হা/৬৮৪৮, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত।

24 আবূ দাঊদ, হা/১৫২৯, সনদ 'ছহীহ', আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, আবূ দাঊদের শব্দগুলি এরূপ: «مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا

• «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

***(উচ্চারণ:** সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা ওয়ালা ইলা-হা গয়রুক্),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আপনার নাম অতি বরকতময় এবং আপনার সম্মান সুমহান। আপনি ছাড়া কোন (হক্ব) মা'বূদ নেই'।[25]

• «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» 'যে ব্যক্তি وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً বলল, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল'; ইমাম মুসলিম হাদীছটি একই অর্থে বর্ণনা করেন (হা/৪৮৭৯), তিনি আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন এভাবে, «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» 'যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে গেল প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহ্র প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদের প্রতি, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল' (হা/১৫১)।

25 নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লায়লাহ, হা/৮৪৯, সনদ 'ছহীহ', সিলসিলাহ ছহীহাহ, হা/২৫৯৮ দ্রষ্টব্য, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাক্য চারটিকে আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর বলে উল্লেখ করেছেন।

***(উচ্চারণ:** লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুল আরশিল আযীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুস্সামাওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরযি ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম),*

অর্থ: 'মহান এবং পরম সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো (হক্ব) মা'বূদ নেই। মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন (হক্ব) মা'বূদ নেই। সম্মানিত আরশের প্রতিপালক এবং আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত কোনো (হক্ব) মা'বূদ নেই'।[26]

- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧﴾ [البقرة: ١٢٧]

***(উচ্চারণ:** রব্বানা- তাক্বাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম),*

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে ক্ববূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ১২৭)*।

- ﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ ﴾ [البقرة: ٢٠١]

---

26 বুখারী, হা/৬৩৪৬; মুসলিম, হা/৬৯২১, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত।

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া- হাসানাহ ওয়া ফিলআ-খিরতি হাসানাহ ওয়া ক্বিনা- ‘আযা-বান্না-র),*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও পরকাল উভয় জীবনে কল্যাণ দান করুন। আর আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন’ *(বাক্বারাহ ২০১)*।

- ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ [البقرة: ٢٨٦]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- লা-তুআ-খিয্‌না- ইন নাসীনা- আও আখত্বা’না-, রব্বানা- ওয়ালা- তাহমিল ‘আলাইনা- ইছরান কামা- হামাল্‌তাহূ ‘আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা-, রব্বানা- ওয়ালা- তুহাম্মিল্‌না- মা-লা- ত্ব-ক্বাতা লানা- বিহ্‌, ওয়া‘ফু আন্না- ওয়াগফির লানা- ওয়ার হামনা-, আনতা মাওলা-না- ফানছুরনা- ‘আলাল ক্বওমিল কাফিরীন),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দায়িত্ব

অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন। হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব, আপনি আমাদের পাপ মোচন করে দিন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

- ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٨﴾ [ال عمران: ٨]

(উচ্চারণ: *রব্বানা- লা-তুযিগ্ ক্বুলূবানা- বা'দা ইয্ হাদায়তানা-, ওয়া হাব্ লানা- মিল্লাদুনকা রহমাহ্, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হা-ব),*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আপনি আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি বড় দাতা' *(আলে ইমরান ৮)*।

- ﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦﴾ [ال عمران: ١٦]

(উচ্চারণ: *রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগফির্ লানা- যুনূবানা-, ওয়া ক্বিনা- 'আযা-বান্না-র),*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, আপনি আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আর আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন' *(আলে ইমরান ১৬)*।

- ﴿قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾[آل عمران: ٣٨]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি হাব্ লী মিল্লাদুন্কা যুর্রিইয়াতান ত্বইয়্যেবাহ, ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ-),*

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩৮)*।

- ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ٥٣﴾ [آل عمران: ٥٣]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- আ-মান্না- বিমা- আন্যালতা, ওয়াত্তাবা'নার্ রসূলা ফাকতুবনা- মা'আশ্শা-হিদীন),*

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি, যা আপনি নাযিল করেছেন। আর আমরা রাসূলের

আনুগত্য করেছি। অতএব, আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করে নিন’ *(আলে ইমরান ৫৩)*।

- ﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣ ﴾ [ال عمران: ١٩٣]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- ইন্নানা- সামি‘না মুনা-দিইয়াই ইউনা-দী লিল্ঈমা-নি আন আ-মিনূ বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না-, রব্বানা- ফাগ্‌ফির লানা- যুনূবানা-, ওয়া কাফ্‌ফির আন্না- সাইয়্যেআ-তিনা-, ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা- মা‘আল আবরা-র, রব্বানা- ওয়া আ-তিনা- মা- ওয়াদ্‌তানা- ‘আলা- রুসুলিকা ওয়ালা- তুখযিনা- ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী‘আদ),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি এভাবে আহ্বান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। ফলে আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমাদের পাপসমূহ মোচন করে দিন। আর আপনি আমাদেরকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দান করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের জন্য আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে যার ওয়াদা করেছেন, তা

আমাদেরকে দান করুন এবং ক্বিয়ামতের দিন আপনি আমাদেরকে অপমানিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার’ *(আলে ইমরান ১৯৩-১৯৪)*।

• ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾[الاعراف: ٢٣]

***(উচ্চারণ:** রব্বানা- যলামনা- আনফুসানা-, ওয়া ইল্লাম তাগফির্ লানা- ওয়া তারহাম্না- লানাকূনান্না মিনাল খ-সিরীন),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(আ‘রাফ ২৩)*।

• ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾﴾ [الاعراف: ٤٧]

***(উচ্চারণ:** রব্বানা- লা- তাজ‘আল্না- মা‘আল ক্বওমিয্ য-লিমীন),*

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যালেমদের সঙ্গী করবেন না’ *(আ‘রাফ ৪৭)*।

• ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَـٰفِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ۞ وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ﴾ [الاعراف: ١٥٥، ١٥٦]

*(**উচ্চারণ:** আনতা ওয়ালিইয়ুনা- ফাগফির্ লানা- ওয়ার্হাম্না-, ওয়া আনতা খয়রুল গ-ফিরীন, ওয়াক্তুব্ লানা- ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল্আ-খিরাহ),*

অর্থ: 'আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনিইতো সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। আর দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দিন' *(আ'রাফ ১৫৫-১৫৬)*।

- ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٥ ﴾ [يونس: ٨٥]

*(**উচ্চারণ:** 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কাল্না-, রব্বানা- লা-তাজ'আল্না- ফিতনাতান লিল্ক্বওমিয্ য-লিমীন, ওয়া নাজ্জিনা- বিরহমাতিকা মিনাল ক্বওমিল কাফিরীন),*

অর্থ: 'আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ দ্বারা কাফেরগোষ্ঠীর কবল থেকে উদ্ধার করুন' *(ইউনুস ৮৫-৮৬)*।

- ﴿ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١ ﴾ [ابراهيم: ٤٠، ٤١]

*(**উচ্চারণ:** রব্বিজ্‘আল্নী মুক্বীমাছ্ ছলা-তি ওয়া মিন যুর্রিইয়াতি, রব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল্ দু‘আ-, রব্বানা-গ্ফির্ লী ওয়া লিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু’মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব),*

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ছালাত ক্বায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দো‘আ ক্ববূল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে হিসাব-নিক্বাশের দিন ক্ষমা করুন’ *(ইবরাহীম ৪০-৪১)*।

- ﴿رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾ [الاسراء: ٢٤]

*(**উচ্চারণ:** রব্বির্হামহুমা- কামা- রব্বাইয়া-নী ছগীরা),*

অর্থ: ‘হে আমার রব! আপনি তাদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’ *(ইসরা ৩৪)*।

- ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةٗ وَهَيِّئۡ لَنَا مِنۡ أَمۡرِنَا رَشَدٗا ١٠ ﴾ [الكهف: ١٠]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- আ-তিনা- মিল্লাদুন্কা রহমাহ, ওয়া হাইয়ি’ লানা- মিন আমরিনা- রশাদা),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন’ *(কাহ্‌ফ ১০)*।

- ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ۝ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ۝ ﴾ [طه: ٢٥، ٢٦]

*(**উচ্চারণ:** রব্বিশ্‌রহ লী ছদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সির লী আমরী),*

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন’ *(ত্ব-হা ২৫-২৬)*।

- ﴿ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴾[طه: ١١٤]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি যিদ্‌নী ‘ইলমা),*

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’ *(ত্ব-হা ১১৪)*।

- ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الانبياء: ٨٧]

*(**উচ্চারণ:** লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ য-লিমীন),*

অর্থ: ‘আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।’ *(আম্বিয়া ৮৭)*।

• ﴿رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ۝٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ۝٩٨﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٨]

***(উচ্চারণ:** রব্বি আ'ঊযুবিকা মিন হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন, ওয়া আ'ঊযুবিকা রব্বি আইইয়াহ্যুরূন),*

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানদের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুমিনূন ৮৭-৮৮)*।

• ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩]

***(উচ্চারণ:** রব্বানা- আ-মান্না- ফাগফির্ লানা- ওয়ার্হামনা- ওয়া আনতা খয়রুর্ র-হিমীন),*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনিইতো সর্বোত্তম দয়ালু' *(মুমিনূন ১০৯)*।

• ﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

***(উচ্চারণ:** রব্বিগ্ফির্ ওয়ার্হাম্ ওয়া আনতা খয়রুর্ র-হিমীন),*

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আপনিইতো সর্বোত্তম দয়ালু' *(মুমিনূন ১১৮)*।

• ﴿ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ ﴾ [الفرقان: ٦٤]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানাছ্‌রিফ্‌ 'আন্না-'আযা-বা জাহান্নামা, ইন্না 'আযা-বাহা কা-না গরা-মা),*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে দিন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি অপ্রতিহত' *(ফুরক্বান ৬৫)*।

• ﴿رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- হাব্‌ লানা- মিন আয্‌ওয়া-জিনা- ওয়া যুর্‌রিইয়া-তিনা- ক্বুর্‌রাতা আ'য়ুন, ওয়াজ্‌'আলনা- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা),*

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখ জুড়ানো আনন্দ প্রদান করুন। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন' *(ফুরক্বান ৭৪)*।

• ﴿ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি আওযি‘নী আন আশকুরা নি‘মাতাকাল্লাতী আন‘আমতা ‘আলাইয়া ওয়া ‘আলা- ওয়া-লিদাইয়া, ওয়া আন আ‘মালা ছ-লিহান তারযা-হু, ওয়া আদ্‌খিলনী বিরহমাতিকা ফী ইবা-দিকাছ্ ছ-লিহীন),*

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনার প্রদত্ত নে‘মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আপনি আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন’ *(নামল ১৯)*।

• ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي﴾ [القصص: ١٦]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফির লী),*

অর্থ: ‘হে আমার পালনকর্তা! আমিতো নিজের উপর যুলম করে ফেলেছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’ *(ক্বাছাছ ১৬)*।

• ﴿ رَبِّ هَبۡ لِي مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [الصافات: ١٠٠]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি হাব্ লী মিনাছ্ ছ-লিহীন),*

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সৎসন্তান দান করুন' *(ছফ্‌ফা-ত ১০০)*।

- ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الاحقاف: ١٥]

*(**উচ্চারণ:** রব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলাইয়া ওয়া 'আলা- ওয়া-লিদাইয়া, ওয়া আন আ'মালা ছ-লিহান তারযা-হু, ওয়া আছলিহ্ লী ফী যুর্‌রিইয়াতি, ইন্নী তুবতু ইলাইকা, ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন),*

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনার প্রদত্ত নে'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আপনি আমাকে আমার সন্তানদের ক্ষেত্রে সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং আমি মুসলিমদের অন্যতম' *(আহক্বাফ ১৫)*।

- ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾ [الحشر: ١٠]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানাগ্‌ফির্ লানা- ওয়া লিইখ্‌ওয়া-নিনাল্লাযীনা সাবাক্বূনা- বিলঈমা-ন, ওয়ালা- তাজ‘আল ফী ক্বুলূবিনা- গিল্লাল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা- ইন্নাকা রঊফুর রহীম),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ আপনি রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়” *(হাশর ১০)*।

- ﴿رَّبَّنَا عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٥﴾[الممتحنة: ٤، ٥]

*(**উচ্চারণ:** রব্বানা- ‘আলাইকা তাওয়াক্কাল্‌না- ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না- ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর, রব্বানা- লা-তাজ‘আল্‌না- ফিতনাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ, ওয়াগ্‌ফির্ লানা- রব্বানা-, ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম),*

অর্থ: ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার উপরই ভরসা করেছি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের

পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(মুমতাহানাহ ৩-৪)*।

- «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খলাক্বতানী ওয়া আনা 'আব্দুকা ওয়া আনা 'আলা-'আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্ব'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ছনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ লাকা বিযাম্বী ফাগফির লী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক, আপনি ব্যতীত আর কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর সাধ্যানুযায়ী আমি আপনার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আপনার কাছে আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত নে'মতের স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং আপনার নিকট আমার গোনাহ স্বীকার করে নিচ্ছি। অতএব, আপনি

আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ব্যতীত আর কেউ গোনাহসমূহ মার্জনা করতে পারে না’।[27]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

***(উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরান, ওয়ালা- ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা, ফাগফির লী মাগফিরাতাম্ মিন ‘ইনদিকা ওয়ার্হামনী, ইন্নাকা আনতাল গফূরুর্ রহীম),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুলম করেছি, আর আপনি ব্যতীত অন্য কেউ ঐসব গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না। অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আপনি আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু’।[28]

---

27 বুখারী, হা/৬৩০৬, শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দো‘আটিকে ‘সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার’ বা ‘ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ’ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

28 বুখারী, হা/৮৩৪; মুসলিম, হা/৬৮৬৯, আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

• «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি ওয়াল আয্‌জি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া যলাইদ্ দাইনি ওয়া গলাবাতির্ রিজা-ল),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (ঘটিত কোনো বিষয়ে) দুশ্চিন্তা, (আগত কোনো বিষয়ে) চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[29]

• «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'ঊযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা-আরযালিল্ উমুর, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুন্‌ইয়া-, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বব্‌র),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জরাজীর্ণ

29 বুখারী, হা/৬৩৬৯, আনাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত।

বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, দুনিয়ার ফেৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং ক্বরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[30]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

***(উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি, ওয়া মিন ফিতনাতিল ক্বব্‌রি ওয়া 'আযা-বিল ক্বব্‌র, ওয়া মিন ফিতনাতিন্‌ না-রি ওয়া 'আযা-বিন না-র, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল গিনা-, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল ফাক্বরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল। আল্লা-হুম্মাগ্‌সিল 'আন্নী খত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-ইছ্‌ ছালজি ওয়াল বারাদ, ওয়া নাক্বি ক্বলবী মিনাল খত্বা-ইয়া- কামা নাক্কায়তাছ্‌ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ্‌ দানাস, ওয়া বা-*

---

30 বুখারী, হা/৬৩৬৫, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত।

'ইদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আদ্‌তা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব),

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অলসতা, অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থা, পাপ ও ঋণ থেকে এবং ক্বরের ফেৎনা, ক্বরের আযাব, জাহান্নামের ফেৎনা, জাহান্নামের আযাব ও ধন-সম্পদের ফেৎনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট দরিদ্রতার ফেৎনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট আরো প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফেৎনা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপরাশিকে বরফ ও শিশিরের পানি দিয়ে ধুয়ে দিন। আপনি আমার অন্তরকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে ছাফ করে দিন, যেমনিভাবে ময়লা থেকে সাদা কাপড়কে ছাফ করে দেন। আপনি আমার এবং পাপরাশির মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমনিভাবে আপনি পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন'।[31]

- «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ

---

31 বুখারী, হা/৬৩৬৮; মুসলিম, হা/৬৮৭১, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত।

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

*(**উচ্চারণ:** রব্বিগ্‌ফির্ লী খত্বীআতী ওয়া জাহ্‌লী ওয়া ইসরা-ফী ফী আমরী কুল্লিহী ওয়ামা- আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী খত্বা-ইয়া-ইয়া ওয়া 'আম্‌দী ওয়া জাহ্‌লী ওয়া হায্‌লী ওয়া কুল্লু যা-লিকা 'ইনদী, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী মা- ক্বদ্দামতু ওয়ামা- আখ্‌খারতু ওয়ামা- আসরারতু ওয়ামা- আ'লানতু, আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু ওয়া আনতা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর),*

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, সর্ব বিষয়ে আমার সীমালংঘন এবং যে পাপ সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, তা ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপরাশি, আমার ইচ্ছাকৃত পাপ, অজ্ঞতা ও হালকামিবশতঃ ঘটিত পাপ এবং আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমার পূর্বে কৃত, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য, গোপনীয় এবং প্রকাশ্য যাবতীয় পাপ আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনিই

অগ্রসরকারী এবং পশ্চাতকারী এবং আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান’।[32]

- «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা রব্বাস্ সামাওয়া-তি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল ‘আরশিল আযীম, রব্বানা- ওয়া রব্বা কুল্লি শাই, ফা-লিক্বাল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া-, ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরক্বা-ন, আ‘উযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুন বিনা-ছিয়াতিহী। আল্লা-হুম্মা আনতাল আওওয়ালু ফালায়সা ক্ববলাকা শাই, ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালায়সা বা‘দাকা শাই, ওয়া আনতায্ য-হিরু ফালায়সা ফাওক্বাকা শাই, ওয়া আনতাল বা-ত্বিনু ফালায়সা দূনাকা শাই, ইক্বযি ‘আন্নাদ্ দায়না ওয়া আগ্নিনা- মিনাল ফাক্বর),*

---

32 বুখারী, হা/৬৩৯৮; মুসলিম, হা/৬৯০১, আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু, মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু! বীজ এবং আঁঠি থেকে চারা অঙ্কুরিতকারী! তাওরাত, ইনজীল এবং কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি আপনার কাছে ঐসবকিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলি আপনারই হস্তগত। হে আল্লাহ! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোন কিছুই নেই বা থাকবে না; আপনিই প্রকাশমান ও সবকিছুর উপর বিজয়ী, আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনিই অপ্রকাশমান, আপনি ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আপনি আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করুন'।[33]

• «اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»

(উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মাল),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! যা আমি করেছি, তার অনিষ্ট থেকে এবং যা করিনি, তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[34]

---

33 মুসলিম, হা/৬৮৮৯, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত।

34 মুসলিম, হা/৬৮৯৫, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত।

• «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা আছলেহ্ লী দ্বীনিয়াল্লাযী হুওয়া ‘ইছমাতু আমরী, ওয়া আছলেহ্ লী দুন্ইয়া-ইয়াল্লাতী ফীহা মা‘আ-শী, ওয়া আছলেহ্ লী আ-খেরতিল্লাতী ফীহা মা‘আ-দী, ওয়াজ্‘আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতান লী ফী কুল্লি খায়ের, ওয়াজ্‘আলিল মাওতা রা-হাতান লী মিন কুল্লি শার্র),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীনকে সঠিক করে দিন, যা আমার সবকিছুর উপায়। আর আপনি আমার জন্য আমার দুনিয়াকে সঠিক করে দিন, যাতে রয়েছে আমার জীবিকা। আমার জন্য আমার আখেরাতকেও শুদ্ধ করে দিন, যেখানে হবে আমার প্রত্যাবর্তন। আপনি আমার জীবনকালকে প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে বৃদ্ধি করুন এবং আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্টতা থেকে প্রশান্তি লাভের উপায় করে দিন’।[35]

• «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»

---

35 মুসলিম, হা/৬৯০৩, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্ তুক্বা ওয়াল আফা-ফা ওয়াল গিনা-),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সৎপথের নির্দেশনা, আল্লাহভীরুতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি'।[36]

- «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল আজ্যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া 'আযা-বিল ক্ববরি, আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা- ওয়া যাক্কিহা- আনতা খয়রু মান যাক্কা-হা- আনতা ওয়ালিইয়ুহা- ওয়া মাওলা-হা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন 'ইলমিন লা- ইয়ান্ফা' ওয়া মিন ক্বলবিন লা- ইয়াখ্শা' ওয়া মিন নাফসিন লা- তাশবা' ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা- য়ুসতাজা-বু লাহা),*

---

36 মুসলিম, হা/৬৯০৪, ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, দরিদ্রতা, অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থা এবং ক্বরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে আপনি তাক্বওয়া প্রদান করুন এবং ইহাকে করুন কলুষমুক্ত। ইহাকে নিষ্কলুষ করার সর্বোত্তম সত্ত্বাতো আপনিই এবং আপনিই এর অভিভাবক ও মুনিব। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন ইলম থেকে, যা কল্যাণ বয়ে আনে না; এমন হৃদয় থেকে, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না; এমন অন্তর থেকে, যা কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দো‘আ থেকে, যা ক্ববূল হয় না’।[37]

- «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِى لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া ‘আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খ-ছামতু, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু বিইয্‌যাতিকা, লা- ইলা-হা ইল্লা-*

37 মুসলিম, হা/৬৯০৬, যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

আনতা আন তুযিল্লানী, আনতাল হাইয়ুল্লাযী লা-ইয়ামূত ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইনসু ইয়ামূতূন),

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনারই বশ্যতা স্বীকার করেছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করেছি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আপনার জন্যই আপনার দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা বিবাদ-লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছি। হে আল্লাহ! আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে আপনার ইয্যতের দোহাই দিয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই। আপনি এমন এক চিরঞ্জীব সত্ত্বা, যার কোন মৃত্যু নেই; কিন্তু মানব এবং জিন জাতি মরণশীল'।[38]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ»

(উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি‘মাতিকা ওয়া তাহাওউলি ‘আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী‘ই সাখাত্বিকা),*

---

38 বুখারী, হা/৭৩৮৩; মুসলিম, হা/৬৮৯৯, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার নে‘মত বিলুপ্ত হওয়া থেকে, আপনার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, আপনার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ থেকে এবং আপনার সকল ক্রোধ-অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[39]

- «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»

***(উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা মুছার্রিফাল ক্বুলূব ছর্রিফ ক্বুলূবানা- ‘আলা-ত্ব-‘আতিক),*

অর্থ: ‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তন সাধনকারী আল্লাহ! আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন’।[40]

- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِى كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

***(উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওওয়ালাহু ওয়া আ-খেরাহু ওয়া ‘আলানিয়াতাহু ওয়া সির্রাহু),*

---

39 মুসলিম, হা/৬৯৪৩, ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত।

40 মুসলিম, হা/৬৭৫০, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, আগের-পরের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দিন'।[41]

- «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা রব্বা জিবরা-ঈল ওয়া মীকা-ঈল ওয়া ইসরা-ফীল, ফা-তিরাস সামাওয়া-তি ওয়াল আরযি, 'আ-লিমাল গয়বি ওয়াশ শাহা-দাহ্, আনতা তাহকুমু বায়না 'ইবা-দিকা ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন, ইহ্দিনী লিমাখ্তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা, ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা- ছিরা-তিম মুস্তাক্বীম),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রভু! আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা! গায়েব ও উপস্থিত সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ! আপনার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য করত, আপনি সেসব বিষয়ে তাদের মধ্যে ফায়ছালা দিবেন। হক্কের যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আপনি আমাকে সঠিক পথটি

41 মুসলিম, হা/১০৮৪, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত।

প্রদর্শন করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন’।[42]

- «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা আ‘ঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিক ওয়া বিমু‘আ-ফা-তিকা মিন উক্বূবাতিক, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনকা লা-উহ্ছী ছানা‘আন ‘আলাইকা, আনতা কামা আছনায় ‘আলা-নাফসিক),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে এবং আপনার ক্ষমার মাধ্যমে আপনার শাস্তি ও ক্রোধ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার থেকে আপনারই কাছে। আমি আপনার গুণ-গান করে শেষ করতে পারব না। যেরূপ প্রশংসা আপনি আপনার নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন, আপনি ঠিক তদ্রুপ’।[43]

- «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ»

---

42 মুসলিম, হা/১৮১১, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতে বর্ণিত।

43 মুসলিম, হা/১০৯০, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত।

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা আ‘ঊযুবিকা মিন জাহ্দিল বালা- ওয়া দারাকিশ শাক্বা- ওয়া সূইল ক্বাযা- ওয়া শামা-তাতিল আ‘দা-),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কঠিন বালা-মুছীবত, চরম কষ্ট, ফয়সালার অনিষ্ট এবং (আমার বিরুদ্ধে) শত্রুদের মনতুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[44]

- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى لِسَانِى نُورًا وَفِى سَمْعِى نُورًا وَفِى بَصَرِى نُورًا وَمِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا وَعَنْ يَمِينِى نُورًا وَعَنْ شِمَالِى نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَىَّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى نَفْسِى نُورًا وَأَعْظِمْ لِى نُورًا»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মাজ্‘আল লী ফী ক্বলবী নূরান, ওয়া ফী লিসা-নী নূরান, ওয়া ফী সাম‘ঈ নূরান, ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্বী নূরান, ওয়া মিন তাহ্তী নূরান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া ‘আন শিমা-লী নূরান, ওয়া মিন বাইনি ইয়াদাইয়া নূরান, ওয়া মিন খলফী নূরান, ওয়াজ্‘আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া আ‘যিম লী নূরা),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দিন, যবানে নূর দিন, শ্রবণ শক্তিতে নূর দিন, দৃষ্টি শক্তিতে নূর দিন, আমার উপরে নূর দিন

---

44 বুখারী, হা/৬৩৪৭; মুসলিম, হা/৬৮৭৭, আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত। হাদীছটির শব্দ এরূপ: ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন .....হতে’।

ও নীচে নূর দিন, আমার ডানে নূর দিন ও বামে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন ও পেছনে নূর দিন এবং আমার আত্মায় আপনি নূর দিন। আপনি আমার জন্য জ্যোতিকে অনেক বৃদ্ধি করে দিন'।[45]

- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ছল্লি 'আলা- মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ কামা ছল্লায়তা 'আলা- ইবরা-হীম ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা- মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ কামা বা-রকতা 'আলা- ইবরাহীম ওয়া 'আলা- আ-লি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ (তাদেরকে ভালো হিসেবে স্মরণ) করুন, যেমনিভাবে আপনি ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত, মহা সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি

45 বুখারী, হা/৬৩১৬; মুসলিম, হা/১৭৯৭, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত।

বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর, যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয়ই আপনি মহা প্রশংসিত, মহা সম্মানিত’।[46]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খয়রি কুল্লিহী ‘আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহ্, মা ‘আলিমতু মিনহু ওয়ামা- লাম আ‘লাম, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী ‘আ-জিলিহী ওয়া আ-জিলিহ্, মা ‘আলিমতু মিনহু ওয়ামা- লাম আ‘লাম, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খয়রি মা- সাআলাকা ‘আব্দুকা ওয়া নাবিইয়ুক, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা- ‘আ-যা বিহী ‘আব্দুকা ওয়া নাবিইয়ুক, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়ামা- ক্বর্রাবা*

---

46 বুখারী, হা/৩৩৭০; মুসলিম, হা/৯০৮, কাব ইবনে উজরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

ইলাইহা- মিন ক্বওলিন ওয়া আমাল, ওয়া আ‘ঊযুবিকা মিনান্না-রি ওয়ামা- ক্বর্রাবা ইলাইহা- মিন ক্বওলিন ওয়া আমাল, ওয়া আসআলুকা আন তাজ্‘আলা কুল্লা ক্বাযা-ইন ক্বাযাইতাহূ লী খয়রা),

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জানা-অজানা সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জানা-অজানা সকল অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে প্রার্থনা করেছেন। হে আল্লাহ! আমি এমন অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যা থেকে আপনার বান্দা ও নবী আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে জান্নাত এবং যে কথা বা কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়, তা প্রার্থনা করছি। পক্ষান্তরে আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং যে কথা বা কাজ জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়, তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি যা কিছু আমার জন্য নির্ধারণ করেন, তা যেন আমার জন্য কল্যাণকর করেন’।[47]

---

47 ইবনে মাজাহ, হা/৩৮৪৬, সনদ ‘ছহীহ’, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতে বর্ণিত। আলবানী প্রণীত ‘সিলসিলাহ ছহীহাহ’, হা/১৫৪২।

- «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَد، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা বি‘ইলমিকাল গয়বি ওয়া ক্বুদরাতিকা ‘আলাল খলক্বি আহ্ইনী মা- ‘আলিমতাল হায়া-তা খয়রান লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা- ‘আলিমতাল ওয়াফা-তা খয়রান লী, আল্লা-হুম্মা ওয়া আসআলুকা খশ্ইয়াতাকা ফিল গয়বি ওয়াশ শাহা-দাহ, ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাক্বি ফির্‌রিযা-ই ওয়াল গযাব, ওয়া আসআলুকাল ক্বছদা ফিল ফাক্বরি ওয়াল গিনা-, ওয়া আসআলুকা না‘ঈমান লা- ইয়ান্ফাদ, ওয়া আসআলুকা ক্বুর্রাতা ‘আইনিন লা-তানক্বাতে‘, ওয়া আসআলুকার রিযা- বা‘দাল ক্বাযা-, ওয়া আসআলুকা বারদাল ‘আইশি বা‘দাল মাউত, ওয়া আসআলুকা লাযযাতান্ নাযারি ইলা- ওয়াজ্হিক, ওয়াশ শাওক্বা ইলা- লিক্বা-ইকা ফী গয়রি যর্রা-ইন মুযির্রাহ্ ওয়ালা- ফিতনাতিন মুযিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা যাইয়্যিন্না- বিযীনাতিল ঈমা-ন, ওয়াজ্‘আলনা- হুদা-তান মুহতাদীন),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ্! আপনার গায়েবের জ্ঞান এবং সৃষ্টিকুলের উপর আপনার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে আপনার নিকট এমর্মে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিনের জীবনকাল আপনি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করেন। পক্ষান্তরে আপনি আমাকে এমন সময় মৃত্যু দান করুন, যে সময়ের মৃত্যু আপনি আমার জন্য কল্যাণকর মনে করেন। হে আল্লাহ! গোপনে এবং প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আমি আপনার নিকট আপনার ভীতি প্রার্থনা করছি। সন্তুষ্ট এবং ক্রোধান্বিত উভয় অবস্থায় আমি আপনার নিকট হক্ক কথা বলার তাওফীক্ব প্রার্থনা করছি। দরিদ্রতা এবং ধনাঢ্যতার ক্ষেত্রে আমি আপনার নিকট মধ্যমপন্থা অবলম্বনের তাওফীক্ব প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট অফুরন্ত নে‘মত প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট অবিচ্ছিন্ন চোখ জুড়ানো বস্তু প্রার্থনা করছি। আপনার নিকট আমি তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নিকট মৃত্যুর পরে সুখসমৃদ্ধ জীবন প্রার্থনা করছি। অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা এবং পথভ্রষ্টকারীর ফেৎনা ছাড়াই আমি আপনার নিকট আপনার চেহারা দর্শনের স্বাদ এবং আপনার সাক্ষাত লাভের আকাঙ্খা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঈমানের শোভায়

সুশোভিত করুন এবং আমাদেরকে একদিকে করুন সঠিক পথের দিশারী, অন্যদিকে করুন সুপথপ্রাপ্ত’।[48]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল আ-খেরাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাস্তুর ‘আওরা-তী, ওয়া আ-মিন রও‘আ-তী, আল্লা-হুম্মাহ্ফায্নী মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া ‘আন শিমা-লী ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ‘উযু বিআযামাতিকা আন উগ্তা-লা মিন তাহ্তী),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, আমার পরিবারে ও ধন-সম্পদে আপনার ক্ষমা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপনীয়তা রক্ষা করুন

---

48 নাসাঈ, হা/১৩০৫, সনদ ‘হাসান’, আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

এবং ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন। আপনি আমাকে আমার সামনের-পেছনের, ডানের-বামের এবং উপরের সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযত করুন। আপনার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে আপনার নিকট আমার নিম্নদেশ থেকে মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[49]

- «اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গয়বি ওয়াশ শাহা-দাহ, ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আ'ঊযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ্ শায়ত্বা-নি ওয়া শিরকিহী),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! দৃশ্য এবং অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ! আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা! সবকিছুর প্রভু এবং মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোন হক্ব মা'বূদ

---

49 আবূ দাঊদ, হা/৫০৭৪, সনদ 'ছহীহ', ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত।

নেই। আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শির্কের[50] অনিষ্ট থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[51]

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাছ ছাবা-তা ফিল আমরি, ওয়াল আযীমাতা 'আলার রুশদি, ওয়া আসআলুকা মূজিবা-তি রহমাতিক ওয়া 'আযা-ইমা মাগফিরাতিক, ওয়া আসআলুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুসনা 'ইবা-দাতিক, ওয়া আসআলুকা ক্বলবান সালীমান ওয়া লিসা-নান ছ-দিক্বান, ওয়া আসআলুকা মিন খয়রি মা- তা'লাম, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা- তা'লাম, ইন্নাকা আনতা আল্লা-মুল গুয়ূব),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ়তা এবং হক্কের উপরে ঋজুতা প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে

---

50 অথবা শয়তান ও তার জাল এর অনিষ্ট থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। [সম্পাদক]

51 তিরমিযী, হা/৩৩৯২, সনদ 'ছহীহ', আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত।

এমন আমল প্রার্থনা করছি, যা আপনার রহমত লাভ নিশ্চিত করবে এবং যা আমার জন্য আপনার নিশ্চিত ক্ষমা বয়ে আনবে। আমি আপনার নিকট নিষ্কলুষ অন্তর এবং সত্যবাদী যবান প্রার্থনা করছি। আমি আপনার জানা কল্যাণ প্রার্থনা করছি। অপরপক্ষে আপনার জানা অকল্যাণ থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমার সম্পর্কে আপনার জানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। নিশ্চয়ই আপনি গায়েবী বিষয়সমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত'।[52]

- «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিক, ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক),*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হারাম থেকে রক্ষা করে আপনার হালালের মাধ্যমে পরিতুষ্ট করুন এবং আপনার

---

52 ত্ববারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৭১৩৫, শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, সনদ 'হাসান', আলবানী (রহঃ) প্রণীত 'সিলসিলাহ ছহীহাহ'-এর ৩২২৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ভিন্ন অন্য সবার থেকে আমাকে মুখাপেক্ষীহীন করুন’।[53]

- «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী সাম‘ঈ, আল্লা-হুম্মা ‘আ-ফিনী ফী বাছারী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিন ‘আযা-বিল ক্ববরি, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা),*

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার কানের সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার চোখের সুস্থতা দান করুন। আপনি ছাড়া আর কোন হক্ব মা‘বূদ নেই। হে আল্লাহ! কুফরী এবং দারিদ্র্য থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! ক্ববরের

---

53 তিরমিযী, হা/৩৫৬৩, সনদ ‘হাসান’, আলী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত; আলবানী (রহঃ) প্রণীত ‘সিলসিলাহ ছহীহাহ’-এর ২৬৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

আযাব থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি ব্যতীত আর কোন হক্ব মা‘বূদ নেই’।[54]

- «رَبِّ أَعِنِّى وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِى وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِى وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِى وَيَسِّرِ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِى وَاغْسِلْ حَوْبَتِى وَأَجِبْ دَعْوَتِى وَثَبِّتْ حُجَّتِى وَسَدِّدْ لِسَانِى وَاهْدِ قَلْبِى وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِى»

*(**উচ্চারণ:** রব্বি আ‘ইন্নী ওয়ালা- তু‘ইন ‘আলাইয়া, ওয়ানছুরনী ওয়ালা- তানছুর ‘আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়ালা- তামকুর ‘আলাইয়া, ওয়াহ্দিনী ওয়া ইয়াস্সিরিল হুদা- লী, ওয়ানছুরনী ‘আলা- মান বাগা- ‘আলাইয়া। রব্বিজ‘আলনী লাকা শাক্কা-রান, লাকা যাক্কা-রান, লাকা রাহ্হা-বান, লাকা মিত্বওয়া-‘আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওওয়া-হান মুনীবান। রব্বি তাক্বাব্বাল তাওবাতী ওয়াগসিল হাওবাতী ওয়া আজিব দা‘ওয়াতী ওয়া ছাব্বিত হুজ্জাতী ওয়া সাদ্দিদ লিসা-নী ওয়াহ্দি ক্বলবী ওয়াস্লুল সাখীমাতা ছদ্রী),*

---

54 আবূ দাঊদ, হা/৫০৯০, সনদ ‘হাসান’, আবূ বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত।

অর্থ: ‘হে আমার রব! আপনি আমাকে সাহায্য করুন; আমার বিরুদ্ধে কাউকে আপনি সাহায্য করবেন না। আপনি আমাকে বিজয়ী করুন; আমার বিরুদ্ধে কাউকে আপনি বিজয়ী করবেন না। আপনি আপনার কৌশল দ্বারা আমাকে সাহায্য করুন; আমার বিরুদ্ধে কাউকে আপনার কৌশল দ্বারা সাহায্য করবেন না। আপনি আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং হেদায়াতের পথকে আমার জন্য সহজ করে দিন। আমার প্রতি যে ব্যক্তি অবিচার করে, তার বিরুদ্ধে আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন। হে আমার রব! আপনি আমাকে আপনার অধিক কৃতজ্ঞ, অধিক যিক্‌রকারী, অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত, অধিক আনুগত্যশীল, অধিক নম্র এবং আপনার দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনকারী বান্দায় পরিণত করুন। হে আমার রব! আপনি আমার তওবা ক্ববূল করুন, আমার পাপ ধুয়ে-মুছে ছাফ করে দিন, আমার প্রার্থনা ক্ববূল করুন, আমার প্রমাণাদি দৃঢ় করুন, আমার যবানকে সঠিক বলার তাওফীক্ব দিন, আমার হৃদয়কে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন এবং আমার মনের কালিমা দূর করে দিন’।[55]

---

55 তিরমিযী, হা/৩৫৫১, সনদ ‘ছহীহ’, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত।

• «اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ»

*(**উচ্চারণ:** আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহূ, আল্লা-হুম্মা লা- ক্ব-বিযা লিমা- বাসাত্বা ওয়ালা- বা-সেত্বা লিমা- ক্ববাযতা, ওয়ালা- হা-দিয়া লিমা- আযলালতা ওয়ালা- মুযিল্লা লিমান হাদায়তা, ওয়ালা- মু‘ত্বিয়া লিমা- মানা‘তা ওয়ালা- মা-নে‘আ লিমা আ‘ত্বয়তা, ওয়ালা- মুক্বর্রিবা লিমা- বা-‘আদতা ওয়ালা- মুবা-‘ইদা লিমা- ক্বররাবতা, আল্লা-হুম্মাবসুত্ব ‘আলাইনা- মিন বারাকা-তিকা ওয়া রহমাতিকা ওয়া ফাযলিকা ওয়া রিয্ক্বিক, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকান না‘ঈমাল মুক্বীমাল্লাযী লা- ইয়াহূলু ওয়ালা- ইয়াযূল, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকান না‘ঈমা ইয়াওমাল ‘আয়লাহ্ ওয়াল আমনা ইয়াওমাল*

খয়ফি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী ‘আ-ইযুন বিকা মিন শাররি মা-আ‘ত্বয়তানা- ওয়া শাররি মা- মানা‘তা, আল্লা-হুম্মা হাব্বিব্ ইলাইনাল ঈমা-না ওয়া যাইয়্যিন্‌হু ফী ক্বুলূবিনা-, ওয়া কাররিহ্ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসূক্বা ওয়াল ‘ইছ্ইয়া-ন, ওয়াজ্‘আলনা-মিনার রা-শিদীন, আল্লা-হুম্মা তাওয়াফফানা- মুসলিমীন ওয়া আহ্ইনা- মুসলিমীন, ওয়া আল্‌হিক্বনা- বিছ্ছ-লেহীন গয়রা খযা-ইয়া ওয়ালা- মাফতূনীন, আল্লা-হুম্মা ক্ব-তিলাল কাফারাতাল্লাযীনা ইউকায্‌যিবূনা রুসুলাক ওয়া ইয়াছুদ্দূনা ‘আন সাবীলিক, ওয়াজ্‘আল ‘আলাইহিম রিজ্‌যাকা ওয়া ‘আযা-বাক, আল্লা-হুম্মা ক্ব-তিলাল কাফারাতাল্লাযীনা উতুল কিতা-বা ইলা-হাল হাক্ব),

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য। হে আল্লাহ! আপনি যাকে প্রসারিত করেছেন, তার সংকোচনকারী কেউ নেই আর আপনি যাকে সংকোচন করেছেন, তার প্রসারকারী কেউ নেই। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই আর আপনি যাকে পথপ্রদর্শন করেছেন, তার পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আপনি যাকে মাহরূম করেছেন, তাকে দানকারী কেউ নেই আর আপনি যাকে দান করেছেন, তাকে মাহরূমকারী কেউ নেই। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে নিকটবর্তীকারী কেউ নেই আর আপনি যাকে নিকটবর্তী করেছেন, তাকে দূরবর্তীকারী কেউ নেই। হে আল্লাহ! আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ এবং

রিযিক্ব থেকে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন স্থায়ী নে'মত চাচ্ছি, যা পরিবর্তিত হয় না এবং শেষ হয়েও যায় না। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রয়োজনের দিনে আপনার নে'মত এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার অনিষ্ট থেকে এবং যা দেননি, তার অনিষ্ট থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! ঈমানকে আপনি আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন এবং ইহাকে আপনি আমাদের অন্তরের শোভা করে দিন। পক্ষান্তরে কুফরী, ফাসেক্বী এবং নাফরমানীকে আপনি আমাদের নিকটে ঘৃণিত করে দিন; আর আপনি আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন এবং মুসলিম অবস্থায় আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর কোনরূপ লাঞ্ছনা-বিভ্রান্তি ছাড়াই আপনি আমাদেরকে নেককারগণের সঙ্গে মিলিত করুন। আপনার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং আপনার পথ থেকে বাধাদানকারী কাফের সম্প্রদায়কে নিধনকারী হে আল্লাহ! আপনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। কিতাবধারী কাফের সম্প্রদায়কে নিধনকারী হে আল্লাহ! হে সত্য মা'বূদ!'।[56]

---

56 আহমাদ, হা/১৫৪৯২; বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৬৯৯, সনদ

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন

১. আরাফার দিন সূর্যাস্তের পর হাজীরা পরস্পর পরস্পরকে কষ্ট না দিয়ে শান্তশিষ্টভাবে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবে। মুযদালিফায় পৌঁছে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করবে। হাজীদেরকে মুযদালিফা সীমানায় পৌঁছার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। কেননা সকাল পর্যন্ত মুযদালিফার বাইরে কাটালে সেটি হবে চরম অবহেলার পরিচায়ক। আজকাল মুযদালিফার সীমানা নির্দেশক সাইনবোর্ড এবং সেখানকার উচ্চ শক্তি সম্পন্ন লাইট দেখে খুব সহজেই এই এলাকা চেনা যায়।

২. মুযদালিফায় হাজীরা মাগরিবের সময় পৌঁছাক বা এশার সময় পৌঁছাক সেখানে অবস্থান গ্রহণের পর তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, এক আযান ও দুই এক্বামতে মাগরিব এবং এশার ছালাত জমা-ক্বছর করে আদায় করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছেন।

মুযদালিফায় পৌঁছে অনেক হাজীকে কংকর সংগ্রহে ব্যস্ত হতে দেখা যায়, যেটি ভুল। কেননা মুযদালিফা থেকে মিনাতে

‘ছহীহ’, রিফা‘আহ যুরাক্বী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত।

রওয়ানা হওয়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কংকর কুড়ানো হয় নি।

৩. হাজীরা মুযদালিফাতে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অতএব, কেউ যদি মধ্যরাতের আগে মুযদালিফা ত্যাগ করে, তাহলে তাকে দম (دم) দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, মধ্যরাতের পূর্বে ত্বওয়াফে ইফাদ্বা যেমন জায়েয নয়, তেমনি কংকর নিক্ষেপও জায়েয নয়। মুযদালিফার রাত্রির জন্য ছালাত বা অন্য কোনো ইবাদত নির্দিষ্ট নেই। তবে বছরের অন্য রাত্রিতে একজন মুসলিম যেমন বিতর ছালাত আদায় করে থাকে, এ রাতেও সে তা আদায় করতে পারে।

৪. ফজর উদয় হওয়ার পর প্রথম ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করবে। অতঃপর সকাল খুব পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত যিক্‌র-আযকার এবং দো'আয় মশগূল থাকবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করেছেন। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]

‘অতঃপর যখন ত্বওয়াফের জন্য আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ‘আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। আর তাঁর যিক্‌র কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে তিনি হেদায়াত করেছেন। যদিও ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত’ *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। এখানে ‘মাশ‘আরে হারাম’ বলতে মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটি হারাম এলাকার মধ্যে অবস্থিত। আর আরাফা হচ্ছে ‘মাশ‘আরে হালাল’। কেননা এটি হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত।

৫. দুর্বল নারী, শিশু এবং এজাতীয় হাজীরা শেষ রাতে মুযদালিফা থেকে মিনায় যেতে পারে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী, হা/১৬৭৬; মুসলিম, হা/৩১৩০, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত। বুখারী, হা/১৬৭৮; মুসলিম, হা/৩১২৭, ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত। বুখারী, হা/১৬৭৯; মুসলিম, হা/৩১২২, আসমা বিনতে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) হতে বর্ণিত। বুখারী, হা/১৬৮১; মুসলিম, হা/৩১১৮)*।

কুরবানীর দিনের কাজসমূহ

১. কুরবানীর দিন চারটি কাজ, যথাঃ ক. জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করা, খ. হাদঈ যবাই বা নাহর করা, গ. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেটে ফেলা এবং ঘ. ত্বওয়াফে ইফাদ্বা করা এবং যে ব্যক্তি সা‘ঈ করে নি, তার জন্য এই ত্বওয়াফের পর সা‘ঈ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ধারাবাহিকতা অনুযায়ীই কাজগুলি করেছেন। কেননা তিনি প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করেছেন, অতঃপর হাদঈ নহর/যবেহ করেছেন, অতঃপর মাথা মুণ্ডন করেছেন, অতঃপর ত্বওয়াফ করেছেন। আরবী ভাষায় এই চারটি কাজের প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষরের সমন্বয়ে ‘রানহাত’ (رنحط) শব্দটি গঠন করা হয়েছে। শব্দটি মনে রাখলেই হাজীদের জন্য উক্ত চারটি কাজের ধারাবাহিকতা রপ্ত করা সহজ হবে। ر = رمي (কংকর নিক্ষেপ), ن = نحر (হাদঈ নাহর/যবেহ করা, ح = حلق (মাথা মুণ্ডন করা), ط = طواف (ত্বওয়াফ করা)। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত এই দিনের কাজগুলিকে উক্ত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী করাই উত্তম।[57]

---

57 বাংলা ভাষায় ‘নিকুমাত’ শব্দটি মনে রাখলে বাংলা ভাষাভাষী হাজীরাও উক্ত চারটি কাজের ধারাবাহিকতা রপ্ত করতে পারবে। নি= নিক্ষেপ, কু= কুরবানী, মা= মাথা মুণ্ডন, ত= তওয়াফ। --অনুবাদক।

২. কতিপয় ছাহাবী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে কাজগুলি করে ফেললে তাঁরা এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, কোন সমস্যা নেই। তাঁদের জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপঃ কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন, কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী, কংকর নিক্ষেপের আগে মাথা মুণ্ডন, কংকর নিক্ষেপের আগে ত্বওয়াফে ইফাদ্বা, বিকালে কংকর নিক্ষেপ; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে চাশতের সময় কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। অনুরূপভাবে (তাদের আরও জিজ্ঞাসিত বিষয় ছিল) ত্বওয়াফের আগে সা'ঈ; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে সা'ঈ করেছিলেন। তাছাড়া যেসব ছাহাবী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম)-এর উপর সা'ঈ ছিল, তাঁরা ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে তা আদায় করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন দাঁড়ালে ছাহাবায়ে কেরাম তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন; একজন বললেন, আমি না বুঝেই হাদঈ যবাই করার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি? তিনি বললেন, কোন সমস্যা নেই, এখন হাদঈ প্রদান কর। আরেকজন এসে বললেন, আমি না বুঝে কংকর নিক্ষেপের আগেই হাদঈ যবাই করে ফেলেছি? তিনি বললেন, কোন সমস্যা নেই, এখন কংকর নিক্ষেপ কর। সেদিন আগে-পিছে ঘটে যাওয়া আমল সংক্রান্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কর’ *(বুখারী, হা/১৭৩৬; মুসলিম, হা/৩১৫৬)*। ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘নাহরের দিন (১০ ই যিল-হজ্জ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কংকর নিক্ষেপের আগেই মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি? তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কংকর নিক্ষেপ কর। আরেক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি কংকর নিক্ষেপের আগে হাদঈ যবাই করে ফেলেছি? তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কংকর নিক্ষেপ কর। আরেকজন এসে বললেন, কংকর নিক্ষেপের আগেই ত্বওয়াফে ইফাদ্বা করে ফেলেছি? তিনি বললেন, কোনো

সমস্যা নেই, এখন কংকর নিক্ষেপ কর। আমি সেদিন তাঁকে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে বলতে শুনেছি, কোনো সমস্যা নেই, এখন কর' *(হা/৩১৬৩)*। ইমাম বুখারী (রহেমাহুল্লাহ) একই ধরনের হাদীছ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন *(হা/১৭২২)*। তিনি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নাহরের দিন (১০ই যিল-হজ্জ) মিনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল আর তিনি বলছিলেন, কোনো সমস্যা নেই। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হাদঈ প্রদান করার আগেই আমি মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি? তিনি বললেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন হাদঈ প্রদান কর। লোকটি বললেন, দুপুরের পরে কংকর নিক্ষেপ করেছি? তিনি বললেন, সমস্যা নেই' *(হা/১৭৩৫)*। উসামা ইবনে শারীক (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন,

«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ؟ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا؟ فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِى حَرِجَ وَهَلَكَ»

'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করতে গেলাম। লোকজন তাঁর কাছে আসছিলেন; যারা জিজ্ঞেস করছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ত্বওয়াফের আগে সা'ঈ করে

ফেলেছি? অথবা অমুক কাজটি আগে বা পরে করে ফেলেছি?, তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলছিলেন, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। তবে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সম্মানে আঘাত হানে, তার জন্য সমস্যা রয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো' *(আবূ দাঊদ, হা/২০১৫, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটির সনদ 'ছহীহ')*।

৩. উক্ত চারটি কাজের মধ্যে তিনটির মাধ্যমে হালাল হওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে, কংকর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন এবং ত্বওয়াফ। কেননা এই তিনটি কাজ তামাত্তু, ক্বিরান এবং ইফরাদ তিন প্রকার হজ পালনকারীদেরকেই করতে হয়। অতএব, 'হালাল হওয়ার সাথে হাদঈ প্রদান করার কোনরূপ সম্পর্ক নেই' (وَأَمَّا النَّحْرُ فَلاَ عَلاَقَةَ لَهُ بِالتَّحَلُّلِ)। কেননা হাদঈ প্রদান করা শুধুমাত্র ক্বিরান ও তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদেরকে করতে হয়, ইফরাদ হজ্জ পালনকারীদেরকে করতে হয় না।

যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি কাজ করে ফেলবে, সে পরিপূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। তার জন্য স্ত্রী সহবাসসহ সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তিনটির মধ্যে দু'টি করবে, সে প্রাথমিক হালাল হবে। স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

'ইহরাম বাঁধার সময় ইহরামের উদ্দেশ্যে এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম' *(বুখারী, হা/১৫৩৯; মুসলিম, হা/২৮৪১)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্বওয়াফ ছিল কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুণ্ডনের পরে। তিনটি কাজের যে কোন দু'টি করলে প্রাথমিক হালাল হবে একারণে বলা হয়েছে যে, সেগুলি আগ-পাছ করে সম্পাদন করা জায়েয।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল খুব পরিষ্কার হলে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে মুযদালিফা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে ফাদ্বল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সাতটি কংকর কুড়িয়ে দেন, সকালে যেগুলি তিনি জামরাতুল আক্বাবায় নিক্ষেপ করেন। নাহরের দিন (১০ই যিলহজ্জ) সারা দিন জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করা যায়। তবে সূর্যোদয়ের পরে নিক্ষেপ করা উত্তম। পূর্বে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছে আমরা দেখেছি, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি দুপুরের পরে কংকর

নিক্ষেপ করেছি?, জবাবে তিনি বলেছিলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) বলেন, ‘সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ফজর উদয় হওয়ার পরে এবং সুর্যোদয়ের আগে কংকর নিক্ষেপ করলে তা আদায় হয়ে যাবে’ *(আল-ইজমা/৬৫)*।

কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে সূর্যাস্তের পরে নিক্ষেপ করতে পারবে। নাফে (রহেমাহুল্লাহ) বলেন,

«أَنَّ ابْنَةَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فَأَمَرَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ حِينَ أَتَتَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا»

‘ছফিইয়া বিনতে আবূ উবাইদের ভাতিজি মুযদালিফায় প্রসূতি অবস্থায় পতিত হলে তিনি এবং ছফিইয়া বিলম্ব করে সূর্যাস্তের পরে মিনায় আসেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) ঐসময় তাঁদেরকে কংকর নিক্ষেপ করতে বলেন, কিন্তু তাঁদের উপর কোনো কিছু বর্তায় বলে তিনি মনে করেন নি’[58] *(মুওয়াত্ত্বা, ১/৪০৯)*।

---

[58] অর্থাৎ কোনো দম আসবে বলে তিনি মত দেন নি। সুতরাং সুর্যাস্তের পরে কংকর নিক্ষেপ করলেও কোনো ক্ষতি নেই। এর জন্য কোনো দম দিতে হবে না। এটা শরী‘আতের সহজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। [সম্পাদক]

যাদেরকে শেষ রাতে মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তারা মিনায় পৌঁছেই জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে পারে। আসমা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা)-এর মুক্ত দাস আব্দুল্লাহ বলেন, «فَارْتَحَلْنَا، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا» 'আমরা (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করলাম, অতঃপর আমরা (মিনায়) পৌঁছলে তিনি (আসমা) জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি তাঁর অবস্থান স্থলে ফজরের ছালাত আদায় করলেন' *(বুখারী, হা/১৬৭৯; মুসলিম, হা/৩১২২)*। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّىَ الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِىَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ النَّاسُ»

'সাউদার মত আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিনায় যেয়ে ফজরের ছালাত আদায় করতঃ লোকজনের মিনায় আসার আগেই জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করে নেওয়ার আকাঙ্খা করেছিলাম' *(মুসলিম, হা/৩১২০)*।

৫. হাদঈর পশু উট হলে নাহরের দিনে (১০ই যিল-হজ্জ) এবং তাশরীক্বের তিন দিনে রাত বা দিনের বেলায় যে কোনো

সময় তাকে নহর করতে হবে[59], আর গরু বা ছাগল হলে যবেহ করতে হবে। তামাত্তু, ক্বিরান বা মানতের কারণে পশু যবেহ করা ওয়াজিব হোক কিংবা এমনিতেই নফল হোক একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

স্বাভাবিক কুরবানীর পশু যেমন কমপক্ষে একটি ছাগল অথবা উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ হতে হবে, হজ্জের হাদঈর ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম বলবৎ থাকবে। মেষ বা ভেড়া হলে ৬ মাস বয়স পূর্ণকারীকে কুরবানী করা যাবে। ছাগলের অন্য জাতের পশু হলে কমপক্ষে এক বছর বয়স পূর্ণকারীকে কুরবানী করতে হবে। গরুর বয়স দুই বছর পূর্ণ হতে হবে। আর উটের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হতে হবে।

যবেহ মিনা এবং মক্কায় সম্পন্ন হতে হবে। জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»

---

[59] নাহর হচ্ছে, উটের সামনের বাম পা বেঁধে এর গণ্ডদেশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা। [সম্পাদক]

‘মিনার সম্পূর্ণ এলাকা কুরবানীর স্থান। অনুরূপভাবে মক্কার প্রত্যেকটি এলাকা চলার পথ[60] এবং কুরবানীর স্থান’ *(ইবনে মাজাহ, হা/৩০৪৮, সনদ ‘ছহীহ’)*।

ক্বিরান বা তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হাদঈ দিতে না পারলে হজ্জে তিনটি ছওম পালন করবে এবং বাড়ী ফিরে সাতটি ছওম পালন করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨]

‘বস্তুতঃ যারা কুরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলির মধ্যে তিনটি ছওম পালন করবে আর সাতটি ছওম পালন করবে ফিরে যাবার পর’ *(বাক্বারাহ ১৯৬)*। হজ্জের দিনগুলির তিনটি ছওম এবং বাড়ীতে এসে সাতটি ছওম যেমন ধারাবাহিকভাবে আদায় করা যায়, তেমনি বিচ্ছিন্নভাবেও আদায় করা যায়। হজ্জের দিনগুলির তিনটি ছওম আরাফার দিবসের পূর্বে হজ্জের নিকটতম সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। যে ব্যক্তি এই তিনটি ছওমের সবগুলি অথবা এক বা একাধিক হজ্জের পূর্বে পালন করবে না, সে তাশরীক্বের দিনগুলিতে সেগুলি পালন করবে। ইবনে ওমর ও আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন,

---

[60] অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশের জন্য প্রতিটি পথই অবলম্বন করা যায়, এতে কোনো সমস্যা নেই, যদিও ‘ছানিয়্যাতু কাদা’ দিয়ে মক্কা প্রবেশ করা উত্তম। [সম্পাদক]

«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»

'যে ব্যক্তি হাদঈ দিতে সক্ষম হবে না, সে ছাড়া অন্য কারো জন্য তাশরীক্বের দিনগুলিতে ছওম পালনের অনুমতি দেওয়া হয় নি' *(বুখারী, হা/১৯৯৭)*।

হাদঈদাতার জন্য হাদঈর পশুর গোশত খাওয়া এবং ছাদাক্বা করা উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ۝٢٨﴾ [الحج: ٢٨]

'অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে খাওয়াও' *(হজ্জ ২৮)*। হাদঈদাতা তার হাদঈর গোশত থেকে কাউকে হাদিয়া দিতে পারে; এমনকি হাদিয়া গ্রহণকারী ধনী হলেও কোনো সমস্যা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদঈর গোশত থেকে খেয়েছেন এবং ঝোল পান করেছেন। জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন,

«ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا»

'অতঃপর তিনি কুরবানীর স্থানে এসে নিজ হাতে ৬৩টি (উট) নাহর করেন আর আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কে বাক্বীগুলি নাহর করার দায়িত্ব দেন এবং তাঁকে তাঁর হাদঈতে শরীক করে নেন। অতঃপর প্রত্যেকটি উট থেকে এক টুকরা করে গোশত

পাতিলে একত্রিত করে রান্না করতে বলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়েই উক্ত গোশত থেকে খান এবং ঝোল পান করেন' *(মুসলিম, হা/২৯৫০)*।

অবশ্য হাদঈর গোশত খাওয়া হাদঈদাতার জন্য যরূরী নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাহরকৃত ১০০টি হাদঈ উটের প্রত্যেকটির গোশত খান নি। তাছাড়া তিনি মদীনা থেকে মক্কায় হাদঈর পশু পাঠাতেন, ঐ পশুর গোশত মক্কায় বণ্টন করে দেওয়া হত; তাথেকে তিনি মোটেও খেতেন না। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهْدِى مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»

'রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে কুরবানীর পশু পাঠাতেন; আমি উহার গলায় ফিতা পরিয়ে দিতাম। কিন্তু মুহরিম ব্যক্তি যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব বিষয় থেকে বিরত থাকতেন না[61]' *(বুখারী, হা/১৬৯৮; মুসলিম, হা/৩১৯৪)*।

---

[61] অর্থাৎ কেউ ইচ্ছা করলে হজ্জ বা উমরার ইহরাম না করলেও মক্কায় হাদঈ পাঠাতে পারে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাদঈ পাঠিয়ে সেখানে তা যবাই করার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করতে পারে। হাদঈ পাঠালেই মুহরিম হয়ে যায়

৬. কুরবানীর দিনের তৃতীয় কাজ হচ্ছে, মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছেটে ফেলা। ওমরার কাজসমূহ সম্পর্কে আলোচনার শেষের দিকে এ বিষয়ে আলোচনা গত হয়ে গেছে।

৭. কুরবানীর দিনের চতুর্থ কাজ হচ্ছে, ত্বওয়াফে ইফাদ্বা করা। এই ত্বওয়াফ হজ্জের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম; এটি ব্যতীত হজ্জ পূর্ণ হবে না। হজ্জের রুকনসমূহ সম্পর্কে আলোচনার সময় এটি রুকন হওয়ার দলীল আলোচনা করা হয়েছে। ত্বওয়াফে ইফাদ্বা তাশরীক্বের দিনগুলিতে বা তার পরেও সম্পাদন করা যায়। ক্বিরান বা ইফরাদ হজ্জ পালনকারী যদি ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে সা'ঈ না করে থাকে অথবা আরাফায় অবস্থানের পরে ছাড়া যদি মক্কায় না এসে থাকে, তাহলে ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা'ঈ করে নিবে। কেননা ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ পালনকারীকে একটি সা'ঈ করতে হয় আর এই সা'ঈ দুই সময়ে করা যায়: ১. ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে, ২. ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রথম সময়ে তা সম্পাদন করে না, তাকে দ্বিতীয় সময়ে তা সম্পাদন করতে হয়।

পক্ষান্তরে তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্য ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে সা'ঈ করা আবশ্যক। কেননা তার উপরে দু'টি

না বা মুহরিমের মত আচরণ করার দরকার হয় না, অনুরূপভাবে হাদঈ যবাই হলেই তা থেকে খেতে হবে এমন নয়। [সম্পাদক]

ত্বওয়াফ এবং দু’টি সা‘ঈ ওয়াজিব। একটি ত্বওয়াফ এবং একটি সা‘ঈ ওমরার জন্য আর অপর সা‘ঈ এবং ত্বওয়াফটি হজ্জের জন্য। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে মুহাজির, আনছার ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ ইহরাম বাঁধলেন এবং আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। অতঃপর আমরা মক্কায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ»

‘যারা হাদঈর পশুর গলায় ফিতা পরিয়েছে, তারা ব্যতীত তোমরা সবাই তোমাদের হজ্জের ইহরামকে ওমরায় পরিণত কর’। আমরা বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করলাম এবং ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ করলাম। অতঃপর আমাদের স্ত্রীদের কাছে এসে সাধারণ পোষাক পরলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন,

«مَنْ قَلَّدَ الْهَدْىَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»

‘যারা হাদঈর পশুর গলায় ফিতা পরিয়েছে, তারা ঐ পশু তার যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত হালাল হবে না’[62]। অতঃপর

---

[62] অর্থাৎ তারা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তারা উমরা করে হালাল হয় যেতে পারবে না, কারণ তারা কিরান হজ্জ করছে। তারা কেবল ১০ ই যিলহজ্জেই হালাল হতে পারবে; কারণ তখন হাদঈ তার যবাই করার স্থলে পৌঁছে গেছে। [সম্পাদক]

তারবিয়ার দিন সকালে তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে বললেন। অতঃপর হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করে আমরা ত্বওয়াফ এবং সা‘ঈ করতে আসলাম *(বুখারী, হা/১৫৭২, ইমাম বুখারী হাদীছটি ‘মু‘আল্লাক্ব’ভাবে, তবে শক্তিশালী শব্দে (صيغة الجزم) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আবূ কামেল ফুযাইল ইবনে হুসাইন বাছরী বলেন...’)*। তবে ইমাম বায়হাক্বী হাদীছটি ছহীহ সনদে এবং ‘মাউছূল’ সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(সুনান, ৫/২৩)*। ছহীহ বুখারী *(হা/১৫৫৬)* এবং ছহীহ মুসলিম *(হা/২৯১০)*-এ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা)-এর সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের শব্দগুলি এরূপঃ

«فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا»

‘যারা ওমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন, তারা ত্বওয়াফ এবং সা‘ঈ করে হালাল হয়ে গেলেন। অতঃপর মিনা থেকে ফিরে হজ্জের জন্য তারা আরেকটি ত্বওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা ক্বিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন, তারা একটিমাত্র সা‘ঈ করলেন’। হাদীছে তামাত্তু হজ্জ পালনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ‘হজ্জের আরেকটি ত্বওয়াফ’ বলতে সা‘ঈ বুঝানো হয়েছে। কেননা ত্বওয়াফে ইফাদ্বা সর্বপ্রকার হাজীদের জন্যই রুকন, আর তা তাঁরা ইতোমধ্যে করে

ফেলেছেন। তবে জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত নীচের হাদীছ এবং ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা)-এর হাদীছের মধ্যে বাহ্যতঃ বৈপরীত্য মনে হতে পারে। জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবীগণ ছাফা-মারওয়ায় একবারের বেশী সা'ঈ করেন নি' *(মুসলিম, হা/২৯৪২)*। সমাধান হচ্ছে, জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছে ঐসকল ছাহাবী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে, যাঁরা সঙ্গে করে কুরবানীর পশু এনেছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কুরবানীর দিন ছাড়া হালাল হতে পারেন নি। কেননা তাঁরা ত্বওয়াফে ক্বুদূমের পরে একটিমাত্র সা'ঈই করেছিলেন। কিন্তু তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ছাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) দু'টি সা'ঈ করেছিলেন: একটি ওমরার জন্য এবং অপরটি হজ্জের জন্য। বাহ্যতঃ বিপরীত হাদীছদ্বয়ের সমাধানে আরো বলা যায়, ইবনে আব্বাস এবং আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা)-এর হাদীছ তামাত্তু হজ্জ পালনকারী ছাহাবীগণের জন্য আরেকটি সা'ঈ সাব্যস্ত করে; পক্ষান্তরে জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছ তা সাব্যস্ত করে না। আর নিয়ম হচ্ছে, কোনো কিছু সাব্যস্তকারী বক্তব্য তার বিপরীতমুখী না-সূচক বক্তব্যের উপর প্রাধান্য পাবে। আমাদের শায়খ আব্দুল আযীয

ইবনে বায (রহেমাহুল্লাহ) তাঁর হজ্জের বইয়ে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাশরীক্বের দিনগুলিতে মিনায় রাত্রি যাপন

১. সকল হাজী ১১ এবং ১২ তারিখ রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করবে। যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে চলে আসতে চায়, সে ১২ তারিখ অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপের পর সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করবে। পক্ষান্তরে যে বিলম্ব করতে চায়, সে ১৩ তারিখ রাতেও মিনায় রাত্রিযাপন করবে এবং ১৩ তারিখ অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপের পর মিনা ত্যাগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। অতঃপর যে ব্যক্তি প্রথম দুই দিনে তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে থেকে যাবে, তাঁর উপর কোনো পাপ নেই। অবশ্য যারা ভয় করে' *(বাক্বারাহ ২০৩)*। মিনায় যে দু'দিনের কাজ শেষ করতঃ তাড়াহুড়া করে মিনা ত্যাগ করা যায়, সে দু'দিন হচ্ছে, ১১ এবং ১২ তারিখ; নাহরের দিনটি ঐ দু'দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাদঈ/কুরবানী যবেহ/নাহর করার দিন হচ্ছে চারটিঃ **১.** কুরবানীর দিন, **২.** ১১

তারিখ, ইহাকে ‘ইয়াওমুল ক্বার্র’ (يوم القرّ) বা ‘অবস্থান গ্রহণ বা শান্ত হওয়ার দিন’ বলা হয়। কেননা এই দিনে সবাই মিনাতে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। **৩.** **১২** তারিখ, ইহাকে ‘ইয়াওমুন নাফারিল আওওয়াল’ (يوم النفر الأول) বা ‘প্রথম মিনা ত্যাগের দিন’ বলা হয়। **৪.** **১৩** তারিখ, যাকে ‘ইয়াওমুন নাফারিছ ছানী’ (يوم النفر الثاني) বা ‘দ্বিতীয় মিনা ত্যাগের দিন’ বলা হয়।

২. রাতের শুরুর দিক থেকে হোক বা শেষের দিক থেকে হোক, হাজী জেগে থাকুক বা ঘুমিয়ে থাকুক রাতের বেশীর ভাগ সময় মিনায় কাটালেই সেটাকে মিনায় রাত্রিযাপন ধরা হবে।

রাতের অর্ধেকের বেশী সময় মিনায় অবস্থানের মাধ্যমে রাতের বেশীর ভাগ সময় মিনায় কাটানো সম্পন্ন হবে। নিয়ম হচ্ছে, মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত সময়কে দুইভাগে ভাগ করতে হবে। হাজীরা প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ অথবা দ্বিতীয় ভাগ এবং প্রথম ভাগের কিছু অংশ মিনায় কাটাবে। অতএব, কোন হাজী ত্বওয়াফ বা অন্য কোন কাজে মক্কায় যেতে চাইলে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে যাবে। অর্ধরাতে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলে মিনায় রাত্রিযাপন ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩. ১২ তারিখে তাড়াহুড়ো করে মিনা থেকে চলে আসার চাইতে **১৩** তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করাই উত্তম। কেননা নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াহুড়া না করে বিলম্বই করেছেন। এছাড়া বিলম্ব করলে কিছু অতিরিক্ত আমল করা যাবে এবং এর মাধ্যমে হাজী বেশী নেকী প্রাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত আমল হচ্ছে, ১৩ তারিখে মিনায় রাত্রিযাপন এবং ঐদিন অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপ। বিলম্ব করার আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে, ১২ তারিখের ভীড় থেকে হাজী নিরাপদে থাকতে পারবে।

৪. মিনায় দুই বা তিন রাত যাপন করা হজ্জের অন্যতম ওয়াজিব কাজ। এবিষয়ে প্রমাণাদি গত হয়ে গেছে।

৫. ১২ তারিখে কারো মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে গেলে তাকে মিনাতেই রাত কাটাতে হবে এবং ১৩ তারিখ অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। তবে মিনা থেকে রওয়ানা করা অবস্থায় অথবা রওয়ানা হওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকায় সূর্য ডুবে গেলে এই রাত্রিযাপন এবং কংকর নিক্ষেপ যরূরী হবে না। বরং সে মিনা ত্যাগ করতে পারবে। নাফে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলতেন,

«مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى فَلاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ»

‘তাশরীক্বের দিনগুলির মধ্যবর্তী দিনে কারো মিনায় থাকা অবস্থায় যদি সূর্য ডুবে যায়, তাহলে সে পরের দিন কংকর

নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত মিনা ত্যাগ করবে না’ *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, ১/৪০৭)*।

তাশরীক্বের দিনগুলিতে কংকর নিক্ষেপ

১. কুরবানীর দিন পূর্বাহ্নে শুধুমাত্র জামরাতুল আক্বাবায় এবং তাশরীক্বের দিনগুলিতে অপরাহ্নে সবগুলি জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা হজ্জের ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবিষয়ে প্রমাণাদি গত হয়ে গেছে।

২. জামরাতসমূহে নিক্ষেপের কংকর কুড়ানোর নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। সেজন্য মুযদালিফা, মিনা বা মক্কা থেকে তা কুড়ানো যাবে। তাড়াহুড়া করে মিনা ত্যাগকারীদের জন্য ৪৯টি এবং বিলম্বকারীদের জন্য ৭০টি কংকর প্রয়োজন হয়। হাজী নিজে যেমন নিজের কংকর কুড়াতে পারে, তেমনি তার জন্য অন্য কেউও কুড়িয়ে দিতে পারে। অনুরূপভাবে কেউ কংকর বিক্রি করলে তা কিনে নেওয়াও জায়েয রয়েছে। হাজী ছাহেব সবগুলি কংকর যেমন একদিনে কুড়াতে পারে, তেমনি প্রত্যেক দিনের কংকর প্রত্যেক দিনেও কুড়াতে পারে। নবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে জামরাতুল আক্বাবায় আসার পথে তাঁর জন্য মিনা থেকে ৭টি কংকর সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফাদ্বল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘নবী ছাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মুহাস্‌সার এলাকায় প্রবেশ করে বলেন, তোমরা জামরাতুল আক্বাবায় নিক্ষেপের কংকর সংগ্রহ কর’ *(মুসলিম, হা/৩০৮৯)*। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, আমাকে ফাদ্বল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বর্ণনা করেন, ‘নাহরের দিন (১০ই যিল-হজ্জ) সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আমার জন্য কংকর কুড়াও। অতঃপর আমি ছোলার দানার চেয়ে একটু বড় সাইজের কংকর কুড়িয়ে তাঁর হাতে দেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এ জাতীয় কংকর সংগ্রহ কর। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে’ *(বায়হাক্বী, সুনান, ৫/১২৭, সনদ ‘হাসান’)*। সুনানে ইবনে মাজাহ *(হা/৩০২৯)*-তে ছহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে সংগৃহীত কংকরের সংখ্যা ৭টি বলা হয়েছে। তবে এই হাদীছটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)-এর ‘মুরসাল’ হাদীছসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ফাদ্বল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কংকর কুড়িয়েছিলেন এবং জামরাতে আসার পথে তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে আরোহী ছিলেন। পক্ষান্তরে

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই দুর্বলদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার বর্ণনা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন সংক্রান্ত হাদীসে চলে গেছে।

৩. কংকরসমূহ ছোলার দানার চেয়ে একটু বড় সাইজের হতে হবে; এর চেয়ে বড় হওয়া জায়েয নয়। কেননা এর চেয়ে বড় হলে তা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি হিসাবে বিবেচিত হবে।

কংকর ব্যতীত কাঠ, মাটি, লোহা, কাঁচ, হাড় ইত্যাদির টুকরা দিয়ে নিক্ষেপ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কংকর ধৌত করাও যাবে না। কেননা এমর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাজী ছাহেব প্রয়োজনে জামরাতসমূহের আশেপাশে পড়ে থাকা কংকর দিয়েও নিক্ষেপ করতে পারে। কেননা হয় সেগুলি হাজীদের হাত থেকে পড়ে গেছে, আর না হয় কেউ দূর থেকে নিক্ষেপ করতে গিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলেছে। সুতরাং শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে নিক্ষিপ্ত কংকর গণ্য করা হবে না।

৪. হাজীকে নিশ্চিত হতে হবে অথবা বেশীরভাগ ধারণা হতে হবে যে, তার নিক্ষিপ্ত কংকরটি নিক্ষেপের যথাস্থানে গিয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি কংকর আলাদাভাবে নিক্ষেপ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে। সবগুলি কংকর একসঙ্গে নিক্ষেপ করলে হবে না। অনুরূপভাবে

কংকরগুলিকে নিক্ষেপের যথাস্থানে রেখে দিলেও হবে না। কেননা রেখে দেওয়া এবং নিক্ষেপ করা এককথা নয়।

৫. নাহরের দিনের (১০ই যিলহজ্জ এর) আমলসমূহ আলোচনার সময় ঐদিন জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপের সময়সীমা সম্পর্কে আলোচনা গত হয়ে গেছে। তবে তাশরীক্বের দিনগুলিতে প্রত্যেকদিন অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে; এর পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীক্বের দিনগুলিতে প্রত্যেকদিন অপরাহ্নে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, ‘তোমরা (আমার কাছ থেকে) হজ্জের নিয়ম-কানূন শিখ। আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমার এই হজ্জের পরে আমি আর হজ্জ করব না’ *(মুসলিম, হা/৩১৩৭, জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত)*। জাবের (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, ‘কুরবানীর দিন সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু এর পরে নিক্ষেপ করেন অপরাহ্নে’ *(মুসলিম, হা/৩১৪১)*। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘আমরা সময়ের অপেক্ষা করতাম, সূর্য ঢলে গেলেই কংকর নিক্ষেপ করতাম’ *(বুখারী, হা/১৭৪৬)*। নাফে‘ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলতেন, ‘তাশরীক্বের তিন দিনে সূর্য ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করা যাবে না’ *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা,*

১/২৮৪)। ইমাম তিরমিযী জাবের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর হাদীছ *(হা/৮৯৪)* উল্লেখ করার পর বলেন, 'উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, কুরবানীর দিনের পরের দিনগুলিতে অপরাহ্নে ছাড়া কংকর নিক্ষেপ করা যাবে না'।

কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে কংকর নিক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে রাতে নিক্ষেপ করবে। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) তাঁর স্ত্রী ছফিইয়া এবং আরেক জন মহিলাকে সূর্যাস্তের পরে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দেন *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, ১/২৮৪)*। আর যেহেতু তাশরীক্বের দিনগুলিতে কংকর নিক্ষেপের সময়ের তুলনায় কুরবানীর দিনে কংকর নিক্ষেপের সময় বেশী প্রশস্ত, সেহেতু এই দিনগুলিতে রাতে কংকর নিক্ষেপ অধিক যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু দেখাশুনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে রাতে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন *(বায়হাক্বী, ৫/১৫১, সনদ 'হাসান' ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত; হাদীছটির কয়েকটি 'শাহেদ'ও রয়েছে (শায়খ আলবানী প্রণীত 'সিলসিলাহ ছহীহাহ'-এর ২৪৭৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)*।

তবে ১৩ তারিখে সূর্যাস্তের সাথে সাথে কংকর নিক্ষেপের সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব, এই দিনে সূর্যাস্তের পরে কংকর

নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। সেজন্য এই দিন সূর্যাস্তের পূর্বে কেউ কংকর নিক্ষেপ না করে থাকলে তাকে ফিদ্ইয়া দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া হচ্ছে, একটি ছাগল অথবা উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ।

৬. তাশরীক্বের দিনগুলিতে হাজী ছাহেব জামরাতগুলিতে ধারাবাহিকভাবে কংকর নিক্ষেপ করবে। শুরুতে প্রথম জামরাত দিয়ে আরম্ভ করবে; আর এটি হচ্ছে মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী এবং মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী জামরাত। অতঃপর মধ্য জামরাত, এরপর জামরাতুল আক্বাবায় কংকর নিক্ষেপ করবে। এই ধারাবাহিকতার খেলাফ করা জায়েয নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দিন এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই কংকর নিক্ষেপ করেছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় জামরাতে কংকর নিক্ষেপের পর দাঁড়িয়ে দুই হাত উঠিয়ে দো‘আ করবে। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন; প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলেন। অতঃপর একটু সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত উঠিয়ে দো‘আ করেন। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দো‘আ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং

প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলেন। অতঃপর একটু বাম দিকে এসে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ান এবং দুই হাত উঠিয়ে দো'আ করেন। অতঃপর জামরাতুল আক্বাবায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলেন। এরপর তিনি না দাঁড়িয়ে চলে আসেন' *(বুখারী, হা/১৭৫৩)*।

৭. হাজী ছাহেব যে কোনো দিক থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে পারে। তবে মিনাকে ডান দিকে এবং মক্কাকে বাম দিকে রেখে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর সাথে হজ্জ করেন। তিনি ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কে বায়তুল্লাহকে বামে এবং মিনাকে ডানে রেখে বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেন। অতঃপর ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, এখানেই সূরা বাক্বারাহ অবতীর্ণ হয়েছে *(বুখারী, হা/১৭৪৯; মুসলিম, হা/৩১৩৪)*। সম্ভবতঃ ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) কর্তৃক বিশেষতঃ সূরা বাক্বারাহ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, সূরাটি হজ্জের অনেকগুলি আমল ধারণ করেছে। যেমন: কংকর নিক্ষেপ করা। কেননা কংকর নিক্ষেপ নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশিত আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর। অতঃপর যে ব্যক্তি প্রথম দুই দিনে তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া না করে থেকে যাবে, তাঁর উপর কোন পাপ নেই। অবশ্য যারা ভয় করে' *(বাক্বারাহ ২০৩)*।

৮. ইহরামের আলোচনার সময় আমরা ইবনুল মুনযির (রহেমাহুল্লাহ) কর্তৃক উল্লেখিত ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি, ছোট বাচ্চা কংকর নিক্ষেপে সক্ষম না হলে তার পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করে দেওয়া যাবে। অনুরূপভাবে অসুস্থতা, বার্ধক্য বা গর্ভধারণ সম্পর্কিত সমস্যার কারণেও একই বিধান বলবৎ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। তাছাড়া তাদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করে না দিলে কংকর নিক্ষেপের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, আর নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে কংকর নিক্ষেপের কোনো সুযোগ বাক্বী থাকবে না। হজ্জের কার্যাবলীর মধ্যে শুধুমাত্র এই একটি কাজে

স্থলাভিষিক্ততা চলে; অন্য কাজে নয়। অতএব, আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। আর ত্বওয়াফ এবং সা'ঈ কুরবানীর দিনগুলিতে অথবা এরপরে হজ্জের মাসের অবশিষ্ট দিনগুলিতে বা হজ্জের মাসের পরেও সম্পাদন করতে পারবে। কংকর নিক্ষেপে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেক জামরায় প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে, অতঃপর অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। তবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই হজ্জ পালনকারী হতে হবে। হজ্জ পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ কংকর নিক্ষেপ করলে তা গৃহীত হবে না। কেননা হাজী ব্যতীত অন্য কারো জন্য যেমন তার নিজের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়, তেমনি অন্যের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করাও জায়েয নয়।

৯. কংকর নিক্ষেপের মূল কাহিনী হচ্ছে, শয়তান জামরাত এলাকার কয়েকটি স্থানে ইবরাহীম ('আলাইহিস্‌সালাম)-এর সামনে আসলে তিনি তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) 'মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, 'ইবরাহীম ('আলাইহিস্‌সালাম) যখন হজ্জ করতে আসেন, তখন জামরাতুল আক্বাবায় শয়তান তাঁর মুখোমুখি হয়। অতঃপর তিনি তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলে সে মাটিতে গেড়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় জামরাতেও সে তাঁর মুখোমুখি হলে তিনি তাকে

সাতটি কংকর মারেন। ফলে সে মাটিতে গেড়ে যায়। একইভাবে তৃতীয় জামরাতেও শয়তান তাঁর মুখোমুখি হয়। ফলে তিনি তাকে সাতটি কংকর মারেন এবং সে মাটিতে গেড়ে যায়'। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন, 'তোমরা শয়তানকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে থাক এবং তোমাদের জাতির পিতার অনুসরণ করে থাক' *(হাকেম, ১/৪৬৬, তিনি হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং হাফেয যাহাবী তাঁকে সমর্থন করেছেন; আলবানী প্রণীত 'ছহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থের ১১৫৬নং হাদীছ দ্র:; হাকেমের সনদে বর্ণনাকারী হাফ্ছ ইবনে আব্দুল্লাহ-এর নাম পরিবর্তন হয়ে জা'ফর ইবনে আব্দুল্লাহ হয়ে গেছে। কিন্তু বায়হাক্বী হাকেমের সনদে নামটি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন (৫/১৫৩)*।

হাদীছটিতে কংকর মারার মূল কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সা'ঈর আলোচনার সময় সা'ঈর মূল কাহিনী গত হয়ে গেছে এবং ত্বওয়াফের আলোচনার সময় রমল করার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সা'ঈ মূলতঃ ইসমাঈল ('আলাইহিস্সালাম)-এর মায়ের কর্ম থেকে এসেছে। আর উমরাতুল ক্বাযায় রমলের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম) মূলতঃ কাফেরদের সামনে মুসলিমদের শক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ্জ এবং ওমরাতে উক্ত কাজগুলি

করার কারণে সেগুলি সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং মুসলিমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের উদ্দেশ্যে সেগুলি করে থাকে; কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তারা শয়তানকে মারে না- যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকে। আর সেকারণেই তারা বলে, জামরায় কংকর নিক্ষেপ; শয়তানকে নয়।

বিদায়ী ত্বওয়াফ

১. হজ্জ শেষ করে মক্কা ত্যাগের সময় হাজীরা যে ত্বওয়াফ করে থাকে, তাকে বিদায়ী ত্বওয়াফ বলে। এই ত্বওয়াফ হজ্জের অন্যতম একটি ওয়াজিব। ঋতুবতী এবং প্রসূতি অবস্থায় পতিত মহিলা ছাড়া অন্য কাউকে এই ত্বওয়াফ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। হজ্জ ও ওমরার ওয়াজিবসমূহ আলোচনার সময় এই ত্বওয়াফ ওয়াজিব হওয়ার দলীল গত হয়ে গেছে।

২. ওমরাকারীর জন্য বিদায়ী ত্বওয়াফ ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য মুস্তাহাব বা উত্তম। কেননা বিদায়ী ত্বওয়াফ ওয়াজিব সাব্যস্তকারী সবগুলি হাদীছ এসেছে হজ্জের ক্ষেত্রে। সুতরাং ওমরা শেষে কেউ বিদায়ী ত্বওয়াফ না করেই যদি মক্কা ত্যাগ করে, তাহলে তার উপর ফিদ্ইয়া আবশ্যক হবে না।

৩. কোনো হাজী যদি মক্কা ত্যাগের সময় পর্যন্ত ত্বওয়াফে ইফাদ্বাকে বিলম্বিত করে এবং এই ত্বওয়াফ করেই মক্কা ত্যাগ করে, তাহলে এই ত্বওয়াফই তার জন্য যথেষ্ট হবে, তাকে আর বিদায়ী ত্বওয়াফ করতে হবে না। কেননা এক্ষেত্রে ত্বওয়াফে ইফাদ্বা-ই হচ্ছে তার জন্য বায়তুল্লাহ্‌র সর্বশেষ কাজ। ত্বওয়াফে ইফাদ্বার পরে যদি তাকে সা'ঈও করতে হয়, তথাপিও কোন অসুবিধা নেই। কেননা সা'ঈ ত্বওয়াফের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ত্বওয়াফ এবং সা'ঈ উভয় কাজেই আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং দো'আ রয়েছে।

৪. বিদায়ী ত্বওয়াফ শেষে সামনের দিকে মুখ করে স্বাভাবিকভাবে মসজিদ থেকে বের হবে, কা'বার দিকে মুখ করে পশ্চাৎগামী হয়ে বের হবে না- যেমনটি কতিপয় অজ্ঞ মানুষ করে থাকে। কেননা এমর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না; বরং এটি নবাবিষ্কৃত বিদ'আতসমূহের একটি।

মসজিদে নববী যিয়ারত

মসজিদে নববী যিয়ারত করা মুস্তাহাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

‘তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও (নেকীর উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, মসজিদ নববী এবং মসজিদে আক্বছা’ *(বুখারী, হা/১১৮৯, শব্দগুলি ইমাম বুখারীর; মুসলিম, হা/৩৩৮৪)*। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

‘মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে ছালাত আদায়ের নেকীর তুলনায় আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করলে এক হাযার গুণ বেশী নেকী হয়’ *(বুখারী, হা/১১৯০; মুসলিম, হা/৩৩৭৫)*।

একজন মুসলিম মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় ছাড়াও মদীনায় শরী‘আতসম্মত অন্যান্য কাজও করবে। যেমন: মসজিদে ক্বুবায় ছালাত আদায় করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের ক্বরর যিয়ারত করা, বাক্বী নামক ক্বরস্থান যিয়ারত করা এবং উহুদে শহীদগণের ক্বরস্থান যিয়ারত করা। মদীনাতে শুধুমাত্র এই পাঁচটি স্থান যিয়ারত করাই শরী‘আত সম্মত; দলীল না থাকায় অন্যান্য স্থান যিয়ারত করা শরী‘আতসম্মত নয়। ক্বরস্থানগুলি যিয়ারতের সময় শরঈ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, তাহলে এই যিয়ারতের মাধ্যমে যিয়ারতকারী মৃত্যুকে স্মরণ এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের

উপকার লাভ করতে পারবে। আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ»

‘তোমরা ক্ববর যিয়ারত কর। কেননা তা (তোমাদেরকে) মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়’ *(মুসলিম, হা/২২৫৯)*। শরঈ পদ্ধতিতে ক্ববর যিয়ারত করলে যিয়ারতকারীর দো‘আর মাধ্যমে ক্ববরবাসীরাও উপকৃত হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্বী নামক ক্ববরস্থান যিয়ারত করতেন এবং ক্ববরবাসীদের জন্য দো‘আ করতেন।

বিদ‘আতী ক্ববর যিয়ারত থেকে সাবধান থাকতে হবে। যে ক্ববর যিয়ারতের মাধ্যমে ক্ববরবাসীদের নিকট প্রার্থনা করা হয় এবং তাদের সাহায্য চাওয়া হয়, তাকেই বিদ‘আতী ক্ববর যিয়ারত বলে। কেননা দো‘আ বা প্রার্থনা একটি ইবাদত; আর কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨ ﴾ [الجن: ١٨]

‘আর মসজিদসমূহ আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে ডেকো না’ *(জিন ১৮)*। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে হয়। পক্ষান্তরে

অন্যের নিকট দো‘আ করতে হয় না; বরং তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো‘আ করতে হয়।

হজ্জ, ওমরা এবং যিয়ারত একটির সাথে আরেকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। অতএব, একজন মুসলিম একই সফরে হজ্জ, ওমরা এবং যিয়ারত তিনটির উদ্দেশ্যেই আসতে পারে। আবার শুধু হজ্জ এবং ওমরার জন্যও আসতে পারে। অনুরূপভাবে হজ্জ ও ওমরা ছাড়াই শুধু যিয়ারতের জন্যও আসতে পারে। আমি **‘ফাযলুল মাদীনাহ ওয়া আদাবু সুকনাহা ওয়া যিয়ারতিহা’** নামক পৃথক এক পুস্তিকায় মদীনা যিয়ারতের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি হাজীদেরকে এমনভাবে হজ্জ করার তাওফীক্ব দান করুন, যেভাবে হজ্জ করলে তা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে। তিনি তাদের হজ্জকে ক্ববূল করুন, গোনাহখাতা মাফ করুন এবং তাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি প্রত্যেকটি হাজীকে হজ্জের পরে হজ্জের পূর্বের অবস্থার তুলনায় উত্তম অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। যে ভাল ছিল, সে আরো ভাল হয়ে যাক আর যে খারাপ ছিল, সে ভাল হয়ে যাক। ১৪২৮ হিজরীর ১২ই জুমাদাল আখেরায় এই পুস্তিকা লেখার কাজ শেষ হয়। মহান রব্বুল আলামীনের জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। আল্লাহ তাঁর বান্দা ও

রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সকল ছাহাবীর উপর দরূদ, সালাম এবং বরকত বর্ষণ করুন।

সূচীপত্র

- ত্বওয়াফ
- যমযম পানি পান
- ছাফা-মারওয়ায় সা‘ঈ
- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাটা
- ৮ তারিখে মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং মিনায় গমন
- আরাফায় অবস্থান
- কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত কতিপয় যিক্র-আযকার এবং দো‘আ, যেগুলির মাধ্যমে আরাফাসহ অন্যান্য যেকোন স্থানে দো‘আ করা যাবেঃ
- মুযদালিফায় রাত্রি যাপন
- কুরবানীর দিনের কাজসমূহ
- তাশরীক্বের দিনগুলিতে মিনায় রাত্রি যাপন
- তাশরীক্বের দিনগুলিতে কংকর নিক্ষেপ
- বিদায়ী ত্বওয়াফ
- মসজিদে নববী যিয়ারত
- সূচীপত্র